প্রতিদিন

প্রতিদিন

শ্রীমতী বাণী রায়

নবভারত পাবলিশার্স
১৫৩/১ রাধাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়

করকমলেষু

লেখিকার অন্যান্য বই

জুপিটার
পুনরাবৃত্তি
রঞ্জন রশ্মি
শূন্যের অঙ্ক
প্রেম
সপ্তসাগর
হাসিকান্নার দিন
উষা-অনিরুদ্ধ
ও
হৃদয়ের মৃত্যু
শ্রীলতা ও সম্পা

পরিচিতি

আমার গল্প লিখবার অভ্যাস বহুদিনের। নিজের মনেই গোপনে লিখতাম খাতার পাতা ভর্তি করে। শৈশবের দুই-একটি খাতা এখনও মাঝে মাঝে পড়ি।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব নিয়ে লিখেছি যখন এম, এ, ক্লাসের ছাত্রী। সেইসব গল্প তখনই প্রকাশিত হয়। তারপরেই সাহিত্য-জীবনের স্থায়ী সূচনা।

একের পর এক গল্প প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে ধৃত হ'তে লাগল। তখন কোন কোন সমালোচকের রূঢ় সমালোচনায় বিস্ময় বোধ করেছি। অপরিণতমতি, নূতন লেখিকার কাছ থেকে তাঁরা আশা করেছিলেন জীবনের সর্বদিকের চরম অভিজ্ঞতা। আমার পিতৃতুল্য লেখকের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনায় আমার রচনা কোনখানে অপূর্ণ বা বিফল, দেখাবার উৎসাহ দেখেছিলাম। আমার বাধা কোথায়, আমার পক্ষে আমার গৃহগত ও অনভিজ্ঞ জীবনকে কতদূর অতিক্রম করা চলে,—একমুহূর্তের জন্যও তাঁরা ভেবে দেখেননি।

তবু, এইসব নিষ্ঠুর সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চিন্তিত করেছেন নিঃসন্দেহে। আমি নিত্য নূতন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার যৎসামান্য সৃষ্টির কোথাও শান্তি বা পরিতৃপ্তি খুঁজে পাইনি। বিশেষদিন থেকে প্রতিদিনের মধ্যে অশান্ত মন আজও আন্দোলিত হচ্ছে।

ছোটগল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেছি। অনেক সময়ে অনেকে বুঝতেও পারেননি। তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। পূর্বে আমার পুস্তকাবলীর কোথাও নিজের কোন বক্তব্য রাখতাম না। তবে কয়েকটি বইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা আবশ্যক হয়েছিল। কারণ, কিছুদিন পর্যন্ত লোকের সন্দেহ ছিল বাণীরায় একজন ছদ্মনামা পুরুষ।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে গল্প, প্রধানতঃ, কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। কল্পনাপ্রসূ যে কাহিনী, সে হয়ত জীবনে প্রতিদিন ঘটেনা। প্রতিদিনের ঘটনা নিয়ে যে কাহিনী আমরা রচনা করে থাকি, লিখন-ভঙ্গি তার দুইরূপ।

সাধারণ ঘটনা আলোকচিত্রের প্রথায় অঙ্কিত করে যাওয়া; কিম্বা সাধারণের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে অসাধারণকে দেখা ও দেখিয়ে দেওয়া। অবশ্য দুইটি লিখন-ভঙ্গি পরস্পরের মুখাপেক্ষী।

শৈশব থেকে রচনায় অভ্যস্ত যে, তার মনের গঠন হয় অনিবার্য রোমান্টিক। শিশু নিজের জগতের বাইরের বস্তুর প্রতি কৌতূহলী। স্বভাবকে অতিক্রম করে যে সৃষ্টি, তাতেই তার লোভ। তাই খেলাঘরের ঘোড়া টুকটুকে লাল, হাঁস হলদে-সবুজ ডোরাটানা। পেঁচার চেহারা মানুষের মত, মানুষের মূর্তি জন্তুর মত। শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য ব্যবস্থা স্বাভাবিক বস্তুর—কিন্তু সে চায় এই অপার্থিব!

মনের রাশ ধরে টেনে নামান হয় তাকে প্রতিদিনের মধ্যে। চারপাশে দেখি যাদের, তারাও যে সাহিত্যের প্রকাণ্ড উপাদানে, এ চিন্তা স্রষ্টার মনে আসে। নিজের জগৎ বিমুগ্ধ করে শিল্পীকে। সে প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনা-সংস্থান শিল্পের বিষয়-বস্তু করে নেয়। তবে, এই শৈশবের অভ্যস্ত মন চায় সামান্যের মধ্যে অসামান্য। প্রতিদিনের পেছনে অনির্বচনীয়কে খুঁজে মরে। এবং, কখনও সে পায়ও।

পরিনিততর প্রজ্ঞার সোৎসাহ সমর্থনে রোমান্টিক মন মাথা নামায়—প্রেমকে অতি প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয় না। স্বপ্ন ও বাস্তব, দুইএর মধ্যে লেখকের কাছে কে অধিকতর প্রভাবশালী, তার পরীক্ষা এখনও হয়নি!

আমার প্রতিদিনের জীবনে যা দেখেছি তাই আজ বলতে এলাম।

বাণী রায়

সূচীপত্র

"প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে সুর।"

কতকগুলি লোক ছিল। খরস্রোতা কোন নদীর কাছের গ্রামে ছিল বাস। এখন সে দেশ পাকিস্তান হয়েছে।

গরীব পৃথিবীর দিনমজুর। মাথার ঘাম পায়ে পড়ে চাষবাসের সময়ে।

কেটে গেল অনেক দিন। একটু একটু করে সরে আসতে লাগল তারা মাটী থেকে। চাষের জন্য আলাদা লোক রাখল, ভাগে জমি দিয়ে দিল। বড় ছেলে শহরে গেল ওকালতি করে নাগরিক হ'তে। কোন কোন মেয়ে বিবাহান্তে গেল শ্বশুরালয় ওই শহরেই।

তবু, ছিল প্রত্যক্ষ যোগ পৃথিবীর সঙ্গে। কাদামাখা মেটে আলু, মুলো, পেঁয়াজ আসত উঠোনে। রবিশস্য কলাই, ছোলা, অড়রে ভাঁড়ার ভরে উঠত। রোদে মেলে দেওয়া ধান পাহারা দিতে কেউ বসত লাঠি হাতে।

তারপরে, ধীরে ধীরে মেটে আলুর বদলে এল নাইনিতাল। ডাল হয়ে তবে রবিশস্য ভাঁড়ারে ঠাঁই পেত। চালের রূপ ধরত সোনার ধান। পিঠে দোলাইএর বদলে ফ্ল্যানেলের পুরো হাতা জামা। সাজিমাটী দিয়ে তারা চুল পরিষ্কার ছেড়ে দিল—কিনে নিল বিদেশী সুরভিত সাবান। দেশী জোলার মোটা সুতোর ডুরে হাহাকার করে পথ ছেড়ে দিল লতা-পাতা পাড়ের মিহি কলের শাড়ীকে।

এসব পুরণো কথা। গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপত্তির দিন চলেই গেছে। গান্ধীজী পারেননি ফিরিয়ে আনতে। তখন ক্ষেতের ধানের মুড়ি উঠোনের মাচার শসা দিয়ে খেতে খেতে কৃষক সৌখিন হয়ে উঠত। ছোট ছেলে ছুটত কাটারি হাতে বেড়ার বাগানে। দুটি পেঁয়াজ খুঁড়ে নিয়ে আসত, ছিঁড়ে দিত একটি লঙ্কা গাছ থেকে। 'রাজভোগ ভেসে যেত।' পাঠশালার পড়ুয়া ফিরে জলযোগ সারত গাছের বাতাবি পেড়ে নিয়ে। ডোবা ছেঁকে উঠত মাছ—পট্‌পট্‌ করে বেগুন কাঁকরোল তুলে মাটীর উনুনে রান্না চাপাত গৃহিনী। উনুনে জ্বলত শুকনো মরা বাড়ীর গাছগুলো।

জোলা বুনত মোটা ধুতি শাড়ী গামছা। শুধু তিন রকম। তা-ও অনেকে চরকা, তকলীকাটা হাতের সুতো লাটাই জড়িয়ে পৌঁছে দিত। কুমোর গড়ত মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি, পূজোর থালি, ঘট। কামার দা-কোদাল-খন্তা-লাঙ্গলের ফাল বানাত। নাপিত ছিল একঘর। পূজারী ব্রাহ্মণ একঘর। আর কি চাই?

জন্ম-নিরোধ জানা ছিল না। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের মেলা। গরু আছে, ছাগল আছে। দুধ দুয়ে নিলেই হ'ল। হাঁস আছে, ডিম দেয়।

কবিরাজ ছিলেন। তবু ঘরে ঘরে উঠোনের এককোণে ছোটখাটো ওষধির চাষ করা হ'ত। দরকার মত তুলে নিলেই হয়। গাঁদালের পাতা দিয়ে পেটের অসুখ সারাত, মনসার পাতা দিয়ে চোখ-ওঠা, ভাঁটির ডাঁটার বড়ি কৃমিতে, থানকুনী হাত-পা ব্যথায়। তুলসী পাতার রস মধু দিয়ে মেড়ে ছোটদের সর্দিজ্বর তাড়ানো হ'ত। সর্বরোগের ওষধি ওখানেই উৎপন্ন হ'ত। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের রূপ।

এসেছিল সৌন্দর্যবোধ পরে। গান্ধীজী বাংলার শিল্পীমনকে বোঝেন নি। তিনি পরিচ্ছন্ন সুস্থ জীবনাদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সৌন্দর্যের বিশেষ স্থান রাখেন নি। কিন্তু, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম উৎপত্তির পরে উৎপন্ন দ্রব্যে শিল্পের রেখাপাত করে তন্ময় হয়ে 'যেত। জোলা পাড়ে গেঁথে দিল আকাশের চাঁদ, বনের ময়ূর। কুমোর হাঁড়ির ওপর নক্সা আঁকল, ঘটে রংচিত্তির করল। কামার বঁটি চাইল ছুতোরের কাছে খোদাই কাজের। পূজোর ফুলের পাশে পাশে মাথা তুলে দাঁড়াল, যারা দেব-দেউলে পাংক্তেয় নয়—পাতাবাহার, দুটো

একটা বিদেশী মৌসুমী। আলপনার চালের গুঁড়োর ওপরে জ্বেলে দিল হ্যাজাক্ আলোর ফোয়ারা লুটিয়ে। গুন্‌গুন্ করে মেয়েরা গান গাইত—কলে-শোনা রেকর্ড। চাঁদের নীল-সাদা জালিকাটা আকাশে চেয়ে নূতন কিছু আবিষ্কার করতে লাগল ছেলেমেয়েরা। ব্রত উপবাসের সময় হ'ল সংক্ষেপ, খোঁপায় মেয়েরা গেঁথে নিল ফুলের হার। শাঁপলার অম্বল রেঁধে খাওয়ার পরেও পদ্মফুল পিতলের ঘটিতে সাজানো হ'ত।

ক্রমবিকাশ হ'ল গ্রামের সৌন্দর্য ও রোমান্সের পথে। গ্রামীন শিল্প যা ছিল, তার ওপরে আধুনিকত্ব আরোপিত হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে এল আধুনিক সভ্যতার ছায়া। আদিযুগের সাধারণ শিল্প, সৌন্দর্যের পরে নির্বোধ মধ্যযুগ এসেছিল। তারও পরের কথা।

মানুষ সময় কাটাতে লাগল ক্ষেতখামার থেকে দূরে। রক্ষিতা রাখার প্রথা উঠে গেল। বহুবিবাহ হেয় হ'ল। যৌনজীবনে এল প্রকাশ্যে বন্ধন। আড়ালের ব্যভিচার রদ করা গেল না। নারীহরণ, নারীনির্যাতন আরম্ভ হ'ল। তখনও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সুরু হয়নি।

গ্রামে জীবনের ক্রমবিবর্তন নিয়ে থিসীস্ লেখা যায়। অবসাদগ্রস্ত আধুনিক ঔপন্যাসিকের প্রথায় পল্লীজীবনকে গরিমার শীর্ষে রেখে, দেশের মাটী, দেশের জলকে বন্দনা করা যায় উচ্চৈঃস্বরে। নগরজীবন কিছু নয়, নাগরিক ঘৃণ্য, হেয়। বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখী—ফিরে চল গ্রামে। আহা উহু, গ্রামের কি সারল্য, কি স্বাস্থ্য, কি শোভা! আর, আমরা সভ্যতার কারখানায়, ইটের খাঁচায় অধঃপাতে যাচ্ছি। সহরের সব মন্দ, পল্লীর সব ভাল।

কিন্তু, মন্দ নিয়েই সুখী আছি। বদলাতে চাইনা। ভেজাল খাদ্য জঠরে, বন্ধ ঘরে টি, বি,—এর দুঃস্বপ্ন—তাও সহ্য হ'বে। আমরা যা পেয়েছি, পল্লী কখনও পেয়েছিল? আমরা জেনেছি। জ্ঞান যে সবচেয়ে বড় সম্পদ।

জ্ঞান-ভাণ্ডার আজ খোলা আমাদের কাছে। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার নগরে বসে মুদ্রনযন্ত্রের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের যশোগান গাইছি। ছাপার অক্ষরে ঝুঁকে বুকের কাছে পাচ্ছি—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মাণীকে। মানুষের সম্পর্কে যা জানবার জানছি আমরা। পল্লী ছিল অজ্ঞান। 'Ignorance Bliss' যারা বলে বলুক—আমি বলব না কখন।

নাইবা খেলাম ক্ষেতের রাঙাচালের ভাত, ঘরের সরবাঁটা ঘি দিয়ে। নাইবা দুধে কব্জী ডুবিয়ে মর্তমানের মাথা চিবোলাম। মাছের কাঁটা-পাতের শেষে জমা করে বিড়ালের ঈর্ষা নাইবা বর্ধন করলাম। ছুটে চলে আসছি বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, প্লেনে। আবহাওয়া আমার পায়ের দাস। রেডিও খুলে বসছি—জগতের শেষ প্রান্ত থেকে স্বর ভেসে আসে আমারি কাছে। পৃথিবীর কোণের সংবাদ ছাপাপৃষ্ঠার ভাঁজে ভাঁজে টেবলে পড়ে থাকে। খাওয়াই কি সব? আমি জেনেছি। আমি চলছি।

মাটীর মায়ায় গৃহবদ্ধ জীবন—কেয়াঝোপের তলায় অন্ধকার, পানাপুকুরের জলে বুদ্‌বুদ বিস্তার, বাতাসে শেফালীগন্ধ। চাইনা আরাম আলস্যের বিলম্বিত শিথিল জীবন। গতি যদি লেগেছে—গতিই থাক।

আর চাইনা—সহস্র জীবনেও চাইনা পল্লীহৃতা হয়ে জন্ম নিতে। সেখানে সমাজ এক হাতে লেখে পুরুষের জন্য অনুশাসন—অন্য হাতে নারীর জন্য। প্রতিবাদ করেনি কেউ কখন। প্রতিবাদ করবার কথা মনেও আসেনি। নারী যতক্ষণ জননীর প্রৌঢ়ত্বে না পা দিয়েছে, কি মূল্য সে পেয়েছে? 'বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ' কাব্যগুঞ্জনেই ভাল শোনায়।

আজ নগরীর প্রান্তে বসে যদি কারুর লেখনী মুখর হয়ে ওঠে প্রতিবাদে, যদি কেউ বাংলার মেয়ের অনেক দিনের অনেক গোপন দুঃখকে ভাষা দিতে চায়, তাহলে কি হ'বে? জানি, মেয়েরাও তার প্রচেষ্টা সমর্থন করবে না। অথচ, যে কোন নবভাবধারার জাগরণ হ'বে এই শহরের বুক থেকেই। সে জাগৃতি তারপর ছড়িয়ে যাবে পল্লীগ্রামের বুকে।

আজ সত্যই বুঝে দেখার দিন এসেছে। মূল্য—আরোপের মানদণ্ড গেছে বদলে। মেয়েরা দুঃখে নেই। কোনদিনও ছিল না। শুধু তারা বুঝে দেখেনি যে মানুষ হিসাবেই তারা মূল্যবান, মেয়ে হিসাবে নয়।

প্রবন্ধ রচনা ছেড়ে ফিরে যাই আখ্যানে। সেইদিন, এখনও যে দিনের জের চলেছে। অসূর্যম্পশ্যা যদি করস্পৃষ্ঠা হয়, কি হ'বে গতি তার? পুরুষ বহুকামী, বহুতে তৃপ্তি। সে তো পতিত হয় না। নৈতিক শুচিবাই শুধু মেয়ের জন্য। সে তো অভ্যস্ত তাতে। স্খলনের চিন্তা প্রকাশ্যে জাগে না তার মনে।

কিন্তু, অনিচ্ছাকৃত অপরাধেরও তো মার্জনা নেই। রক্ষক যদি রক্ষা করতে না পারে, দোষ কার? কার অপরাধ?

কতকগুলি লোক ছিল, না? তাদেরই কন্যা ময়নামতী। বিবাহ স্থির হয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রাম্যকুমারের সঙ্গে। শ্রীমান পড়াশোনা সাঙ্গ করেন নি।

রূপসী ময়না। অনেকের চোখ তার ওপরে। মা বাবা তার যখন তখন বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দু'খানি গ্রামের মধ্যে নিবিড় বন। ডাকাতি হ'ত অনবরত। ময়নার বড়দা সহরে চাকুরি করেন। তাঁর বৌ, ছেলে সেখানে। ময়নার ছোট ভাই সেখানে থেকে পড়ে। গ্রামের বাড়ীর চাষবাস থেকে দেখাশোনা করেন ময়নার বাবা। মা থাকেন গৃহদেবতা নারায়ণ ও বৃদ্ধ শ্বাশুড়ীকে নিয়ে। ময়নার জ্যাঠামশায় শহরের উকীল।

এখনও আসে ক্ষেতের ফসল। গাই দুধ দেয়। কেটে যায় দিন। সৌন্দর্য-বোধের পরে গ্রামীন সভ্যতায় এসেছে সৌখিনতা। দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটাই, হেজলিন, পাউডার, সিগারেট পাজামা। উচ্ছৃঙ্খলতা ছুটে বেড়াচ্ছে ফণী-মনসার বেড়ার গায়ে গায়ে, বিলের ঢেউতে ঢেউতে।

বিবাহ স্থির হওয়ায় ময়নামতী কিঞ্চিৎ 'স্যায়না' হয়েছে। ধরা যেন সরা তার। পরিপুষ্ট তনুদেহে ভিজে কাপড় টেনে একা একা পদ্মফুল-পাতানো সই মেনকার পুকুর থেকে বাড়ী ফেরে স্নানের শেষে, গা-ধোওয়ার শেষে, বেশ খানিকটা দূরে পুকুরটা। বাড়ীর পুকুর মজে গেছে। জ্যাঠামশায় বাড়ী এসে কাটাবেন।

আগে নিষেধ ছিল। একমাস পরে যার বিয়ে হয়ে যাবে পরের ঘরে, তাকে আর কত সামলানো চলে? শিথিল হয়ে এল বাড়ীর নিয়ম। চোখের কটাক্ষে যার বিদ্যুৎ, যার বাহু-আন্দোলনে ফুল ফোটে, তাকে লোভী দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখাই ভালো ছিল।

কেতকীর বেড়ায় কাঁটা। ভিজে কাপড়ের জল বিন্দু বিন্দু ফেলে সগর্বে মাটী শিউরে হাঁটে ময়না। অষ্টাদশ যৌবনের গর্বে গর্বিতা সুন্দরী। কেতকীর ফুলের পাশে কাঁটা। দু'টি চোখ চেয়ে দেখে অনিমেষে। চোখে চোখে ধরা পড়লে রক্ত-অধরে ময়নার তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে। দেখে নিকনা—আর কত দিন!

সাদাৎ আলি, পাশের গ্রামের তালুকদার বাবা। ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারেননি, ছেলে বয়ে গিয়েছিল। এ গ্রামের হাড়ী, ডোম, চাঁড়াল বন্ধু হয়েছে ওর। অনেকদিন আগের কথা।

সন্ধ্যা করে ফেলত ময়না ফিরতে। একদিন অপহৃত হয়ে গেল। সাদাৎ আলির পাল্কী নিয়ে গেল মুখবাঁধা ময়নাকে। পরের কয়েকটা দিন কাটল অনুসন্ধানে।

ফিরে এল ময়না দীর্ঘদিন পরে। কাল হয়েছে রং, মুখচোখ বসে গেছে। মজা পুকুরের ধারে বসে কাঁদছিল। সাদাৎ আলি তাকে উপভোগ করেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু, বশ করতে পারেনি। গাঁয়ের মেয়েকে আর কিছু করতে ইচ্ছা হয়নি। তাকে ছেড়ে দিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে সাদাৎ আলি সম্প্রতি পলাতক। হয়তো কিছুদিন পরে ফিরে আসবে। টাকার জোরে মাঝের পাড়ার পরীবানুকে ঘরে আনবে। ভবিষ্যতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে যাবে হয়তো সাদাৎ আলি।

এধারে ময়না শয্যাশায়ী। উপভুক্তা নারী আর এঁটো হাঁড়ি। কবিরাজ ঔষধ দেয়। পুরোহিত শুদ্ধির বিধান দিলেন। কিন্তু, ঘরে নিল না কেউ। মামলা-পুলিশের কেলেঙ্কারী বাড়ানো হ'ল না।

যুদ্ধের আগের দিন তখন। নৈতিক অধঃপতনকে উপার্জন হিসাবে ব্যবহারের প্রথা তখনও আসেনি। দুর্ভিক্ষ, রক্তপাত মানুষের নীতিবোধকে চূর্ণ করে দিয়ে যেতে পারেনি। পাইকারী ভাবে 'বিলিতি ব্যারাম' সিফিলিস্ আক্রমণ করেনি অজ্ঞান বাংলাবাসীকে। মুসলমান ধর্মের অঙ্গ হিসাবে নারীহরণ চালায়নি। কোন কোন ধর্ষিতাকে ফিরে নিয়ে সমাজ একটুও এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি।

আধুনিক যুগের পূর্বাহ্ণ। তাতে পল্লীগ্রাম। সুতরাং—

শীতের সকাল। ময়নার'মা পা টিপেটিপে ভেজানো দালানঘরের দরজা ঠেলে স্বামীর খাটে এলেন। ছেঁড়া চটে পা মুছে শুতেই ময়নার বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, "বলি কোন, চুলোয় গিয়েছিলে এত ভোরে?"

ময়নার মা অপরাধী ভাবে বল্লেন, "একটু দেখে এলাম।"

"দেখে এলাম! ওর সঙ্গে শোওয়া-বসা হচ্ছে জানলে পতিত হ'তে হবে না?"

"শোওয়া-বসা আবার কি? পেটের মেয়ে। এখন ওর এমন ভয় হয়েছে যে একা রাখা চলে না।"

"চলে না তো থাকো যেয়ে। যত কর্মভোগ হয়েছে আমার।"

শীতার্ত ময়নার বাবা স্ত্রীর কাল-কর্কশ দেহযষ্টি লেপের মধ্যে টেনে নিয়ে গরম হ'তে চেষ্টা করলেন। ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। আছাড় খেয়েছিলেন ময়নার মা শেষ সন্তান জন্মাবার পরে পুকুরঘাটে। তাই রক্ষা। নইলে হয়তো ঘরদোর ভরে যেত।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। পাড়াগাঁর দারুণ শীতে লোকে ভোরে সাধারণতঃ ওঠে না। উপযুক্ত বসনাদি কারুর নেই। তবু, পূজোর ফুলতোলা, শাশুড়ীর দ্বাদশীর যোগাড় দেওয়া আছে। সারারাত ময়নার কাছে কাটানোর ফল স্বামীর দাবী নিরুত্তরে সহ্য করতে হবে। সারারাত ময়নার মায়ের ঘুম হয়নি। মেয়ের দুঃখে সারা রাত কেঁদেছেন তিনি।

হঠাৎ আজ ময়নার মা কেঁদে ফেল্লেন, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি। কাল থেকে আমি অন্যঘরে শোব। চোখের ওপরে অত বড় মেয়ের এই দশা। এখন আমার তোমার সঙ্গে জোড়াখাটে শোওয়া সাজে না। আমার মাথা কাটা যায়!"

খস্‌খস্ করে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল ছুটে গেল। ঘরের থেকে মেয়েকে বার করে না দিলেও ধর্মাত্মা বাবা ময়নাকে ঘরে নেননি। তাই ঢেঁকিশালের কাছাকাছি ছন দিয়ে ঘর তুলে দিয়েছেন। মাটীর দেওয়াল। ভবিষ্যতে গঞ্জের হাট থেকে টিন কিনে ছনের চাল টিনের করা হ'বে, মাটীর বদলে সিমেন্ট। ময়নার বাবা স্নেহশূন্য নন। ময়না নিজে রেঁধে খায়। যেদিন পারে না, সেদিন মা-ই ঘর থেকে রেঁধে চৌকাটের বাইরে থেকে ধরে দেন। লোকচক্ষে ময়না পিত্রালয়ে গৃহীত হয়নি। কোথায় বা যাবে? তাই দয়ালু পিতা উঠোনে ঘর তুলে আলাদা রেখে পিতার কর্তব্য সমাপন করেছেন।

আবার ময়না না অপহৃতা হয়, তারও পাকাপাকি ব্যবস্থা করা আছে।

বাগ্দী চাকর লাঠি হাতে পাহারা দেয়। ভূঁইমালীর বিধবা বৌ কাছে শোয়। ময়নার অনাদর হচ্ছে কে বলে? কিন্তু, গহন রাত্রে যখন দীর্ঘ ছায়া পড়ে মাটীর উঠোনে; পেছনে আম-কাঁঠালের বাগানে শুকনো পাতা চকিত করে শেয়াল পালায় ছুটে; তেঁতুলের ঝিরঝিরে পাতার শিরশিরেনি ছাপিয়ে প্যাঁচার 'তুই থুলি, না মুই থুলি' শোনা যায়; তখন ঘুমন্ত ভূঁইমালী-বৌএর নাকডাকানী ময়নাকে আশ্বাস দিতে পারে না। মনে হয়, ছুটে আসছে অনেক লোক—এক সাদাৎ আলি যেন হাজার হয়েছে। হাজার হাজার সাদাৎ আলি ছুটে আসছে হাজার দিক থেকে।

হাজার হাজার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাজার সাদাৎ আলি। দিকে দিকে উঠেছে ক্রন্দনরোল। ধর্ষিতার করুণ আর্তনাদ। মায়ের চোখের জল ঝরে পড়ছে—ঘাসের ডগায় ডগায় শিশির কেঁদে উঠছে পল্লীদুহিতার ব্যথায়। আবার মুখ বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের উলুখাগড়ার বনে, নদীর তীরে, কাশের ঝোপে, ভাড়াঘরের সুখশয্যায়। শুধু প্রয়োজনে ব্যবহৃত। দেব-দেউলের পূজোর পাত্রে প্রতিদিনের পান্তাভাত খাওয়া। নিষ্ঠুর আসক্তির পীড়নে নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠান। জগতের ইতিহাসে চিরকলঙ্কময় অধ্যায় একটি।

চাপা-ঘুমন্ত গলায় কেঁদে ওঠে ময়না। কই, পিতার দাম্পত্যশয়ন তো তার কান্নায় ব্যাহত হচ্ছে না? তাকে জোর করে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে—দেশের বুক থেকে, ভবিষ্যতের গৃহ থেকে অটুট অন্ধকারের রাজত্বে। কই, এখনও তো ঘরে ঘরে অর্গলবদ্ধ? আছে তো তরুণ, ময়নার দেশেও আছে। কোথায় তারা? তাদের ঘুম কি ভাঙছে না?

ভূঁইমালী-বৌ জেগে ওঠে, সান্ত্বনা দেয়, "ভয় কি, দি'ঠাগরেন? আমি তো এহানে শুয়া আছি। ঘুমের মধ্যি ডরায়া উঠলেন ক্যান?"

কোন-কোনদিন এ সান্ত্বনায় হয়না। ময়নার মাকে দরজা ঠেলে ডেকে আনতে হয়। আজ রাত্রে যা হয়েছিল। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ময়না চাপা কান্নার বেগে অস্থির হয়ে উঠেছিল। দু'তিনমাস হয়ে গেছে ঘটনাটা। তবু আতঙ্কে মনের মধ্যে ময়নার পুনরুক্তি হচ্ছে ব্যাপারটির। শান্ত করতে তাকে না পেরে রাত্রি একপ্রহরের সময় ভূঁইমালী-বৌ দরজা ঠেলে ময়নার মাকে ডেকে এনেছিল। তার পরের ইতিহাস আমরা দেখেছি।

ভোরের রোদ আতাগাছ, পেঁপেগাছের পাতার জালে উঁকি দিয়ে উঠোনে লুটিয়ে পড়ল। ভুঁইমালী-বৌ গোবরজলের ছড়া দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে বাড়ী চলে গেল। কাক-ডাকার ভোর নয়। উঠোনে শালিক নেমে এসেছে। একপাশে চালের গুঁড়ো রোদে দেওয়া হয়েছে। যতই না দুঃখ থাক কেন, পৌষের পিঠে ধর্মেরি অঙ্গ।

ময়নার মা ক্লিষ্ট দেহ টেনে নিয়ে রোজকার কাজে লাগলেন। শাশুড়ীর দ্বাদশীর ফল কেটে হামানদিস্তায় ছেঁচে রাখলেন। গাছের নারকেল কুড়িয়ে তুলে দিলেন। নারকেলের সঙ্গ, মিছরির পানা সাজিয়ে শাশুড়ীকে ডাক দিলেন, "মা, উঠে আসুন। জল মুখে দিন।"

সকালের সোনার রোদ মলিন করে শাশুড়ী ডুকরে উঠলেন, "আমাকে ডেকোনা, মা। কোন্ মুখে জল খাব? চোখের ওপর নাত্নী আমার এমনি হয়ে আছে। ও যে রাজরাণী হ'ত। কোথায় এই অঘ্রাণে বিয়ের বাজনা বাজবে আমার ঘরে, তা-না এই হ'ল! আমি মরলাম না কেন?"

বৃদ্ধা প্রাত্যহিক বিলাপ করেন এইভাবে প্রতি কথায়। আজ সকালের দিকটায় কে যেন কালি ছিটিয়ে দিল। কে যেন সারা বাড়ীর নীরব সমস্যাকে চোখের সামনে তুলে ধরল। কাজের মধ্যে ভুলে থাকার কি উপায় আছে?

ময়না সমাজে পরিত্যক্তা হ'লেও, সমাজের কৌতূহল ছিল প্রচুর। নানা ছল নিয়ে পাড়ার লোকেরা আসত দেখতে। রাত্রি কাটত ময়নার আতঙ্কে, দিনে শুরু হ'ত লজ্জা। পাড়াপ্রতিবেশী, যারা কোনদিন আসেনা, তারাও আসত একবার দ্রষ্টব্য দেখতে। যেখানে সিনেমা নেই, সেখানে এমন নির্দোষ আমোদ কি ছাড়া যায়?

পুরোহিতের বিধবা বোন আসেন কাপাসতুলো নেবার অছিলায়। জমিদার দুহিতা রাজুবালা আসে একহাত চুড়ি-বালা বাজিয়ে অপরাহ্নে গুরু আহার ও দীর্ঘ দিবানিদ্রার পরে। রাজুবালা পালটিঘরের বাধায় পড়েছিল অবশেষে গরীববাড়ী। তাই, পোষায়নি ঘরকরা। পিত্রালয়ে স্থায়ী বাসিন্দা সে। ভাইদের গৃহশিক্ষক প্রণয়ী তার।

ময়না আগে যেত জমিদারবাড়ী। রাজুবালার ঘর দেখেছে। প্রকাণ্ড

খাটে শীতলপাটী বিছানো, বালিশের ধারে বেলফুল। রাত্রি গভীর হ'লে ঘুমন্তপুরী পার হয়ে শিক্ষক আসেন মনিবকন্যার শয়নশিথানে। প্রকাশ্য না হ'লেও জানে সবাই। একে জমিদার দুহিতা, তায় সিঁথের সিঁদুর। বৎসরান্তে দুর্গাপূজা, জামাইষষ্ঠীতে স্বামী আসে। রাজুবালা তখন সোনা ছেড়ে জড়োয়া ঝম্‌ঝমিয়ে বেড়ায় গাধাকান্ত স্বামীকে নিয়ে। শিক্ষক নিশ্বাস ফেলে সরে থাকেন কয়দিন। কে কি বলে রাজুকে? সাধ্য কার? প্রমাণ কি?

গ্রামের দুই ধারে দুই সুর। ব্যভিচার এসেছে। গোপনে রইলে দোষ নেই। প্রকাশ্য ঘটনা হ'লেই শাস্তি। সরল যে নীতিবোধ ছিল, সে হয়েছে শুধু লোকদেখানো উপরের শোভা। নূতন নীতিবোধকে পিছিয়ে-থাকা গ্রাম গ্রহণ করতে পারেনি, অথচ চোরাস্রোত বালি তলে-তলে ক্ষয় করে আনছে। জগা-খিচুড়ি এই আবহাওয়ায় ময়নামতীর দশাটা কি হ'ল ভাবলেই বোঝা যাবে।

সেদিন কিন্তু আকাশে জমে উঠল কালো-কালো মেঘ—ক্রীড়ারত হস্তিযূথের মত! নারিকেল সুপারির শান্ত-নীড় দোলাদিয়ে ঝড়ের বাতাস বয়ে গেল আরক্ত আকাশের বুকে ঘেঁষে। দীঘির জলে দোলা লেগে হাজার পদ্ম কথা কয়ে উঠল—সোনালী মউমাছির মধুমত্ত ডানার স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে গেল কেতকীর পায়ের তলায়। রৌদ্রতপ্ত খড়ের গাদা ভিজিয়ে নামল প্রবল বর্ষা। ঝড়ের পায়ের নীচে লুণ্ঠিতা ধরিত্রী—মুখ তুলে তাকাচ্ছে ঘাসের ফুল। পাতার ছিন্ন দলে বৃষ্টির উল্লাস, ঝরা ফুলে ঝড়ের প্রতাপ। সারা গ্রামটি অন্ধকার করে এল মেঘ, এল ঝড়, এল বৃষ্টি। আর্তনাদ করে উঠল আম-কাঁঠালের বাগিচা। অনেক সহনশীলা, বিদীর্ণা মাটী কেঁপে উঠলেন। এল যুদ্ধ, এল দুর্ভিক্ষ।

কেটে যাক না দীর্ঘদিন—অনেক বৎসর। যুদ্ধের ভয়ে ভীত শহর এল গ্রামে। গ্রামে লাগল শহুরে আমেজ। কিছুদূরে সৈন্যের ছাউনী, নীল আকাশে এরোপ্লেন। কাঁচা পয়সার বিষ কেনা হয়ে ভাসতে লাগল ওই পদ্মদীঘির জলে, কেতকী-বেড়ার কাঁটায়। দুর্ভিক্ষ এল। গ্রাম শহরের দরজায় ভিক্ষা চেয়ে মরল। বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হ'ল। পাইকারী শুদ্ধির বিধান পাওয়া গেল। ময়নামতী ছিল এতদিন সমাজের একটি কঠিন সমস্যা—

বক্র সমস্যা। সমস্ত কিছুই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল ওর উপস্থিতিতে। দশ বারো বছরের মধ্যেই ময়নার সমস্যার গুরুত্ব চলে গেল। যুদ্ধোত্তর জগতে পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে গেল। কিন্তু—

রুদ্রেন সবে ডাকের বাক্স খুলেছে। দোতালার জানালা থেকে সরু একটি মেয়ে-গলায় শোনা গেল,—"এই, এই !"

রুদ্রেন মুখ তুলে তাকাল না। গায়ের ওপরে পিঁপড়ে হেঁটে গেলে যেমন অবহেলাভরে লোক ফিরে চায় না, তেমনি ক্রমাগত ডাক শুনেও রুদ্রেন ওপরে চেয়ে ডাকের লোক দেখল না। চিঠিপত্র খুলে এনে মায়ের কাছে ধরে দিল। সরু তীক্ষ্ণ গলা সমানে ডেকে যাচ্ছে তখনও—"এই, শোন না।"

মা বিকেলবেলা ভিতরের বারান্দায় প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পরচর্চা করছিলেন। নবাগতাকে চারিপাশের চরিত্র সম্পর্কে জানানো রুদ্রেনের মা অবশ্য কর্তব্য মনে করেন। হাঁপানী-ধরা গলার, "এই, এই," ডাক সেখানে পৌঁছে গেল।

নবাগতা সচকিতা—"কে ডাকে ?"

অপ্রতিভা রুদ্রেনের মা বললেন, "আমার এক ননদ। মাথা একটু খারাপ মত হয়ে গেছে। তাই বিয়ে হয়নি। এখানেই থাকে।"

সরু গলাচেরা চীৎকার শোনা গেল, "ও খোকা, চিঠিগুলো দেখিয়ে নিয়ে যা না।"

নবাগতা বল্লেন, "যাওনা রুদ্রেন, পিসী ডাকছেন।"

রুদ্রেন মাথা নেড়ে তাচ্ছিল্যে বলল, "সব সময় উনি অমনি করেন।" চলে গেল সে খেলুড়ীর দলে বাড়ীর বাইরে। গলাও থেমে গেল।

নবাগতা একটু বিমনা হয়ে পড়লেন। মুখরোচক পরনিন্দাও যেন বিরস বোধ হ'ল। রুদ্রেনের মা লক্ষ্য করে ব্যাখ্যাচ্ছলে জবাবদিহি করলেন, "ও সর্বদা ডাকাডাকি করে। ওর বিশ্বাস ওর নামে চিঠি আসবে, ওর সঙ্গে দেখা করতে লোক আসবে। তা, কেউতো আসে না। ওতো পাড়াগাঁয়ে ছিল। এখানে কে চিনবে ? পাকিস্তান হওয়াতে দেশের বাড়ীঘর বেচে এখানে সবাই এসেছিলেন চলে। শ্বশুর শাশুড়ী মারা গেছেন। সম্পত্তি রেখে

গেছেন আধপাগল মেয়েকে। দেওর তো বিদেশে চাকুরি নিয়ে দায় এড়িয়েছে। যত জ্বালা আমারি ঘাড়ে।"

মোটা ঘাড়ের ওপরে চওড়া পাটীহারটা টেনে দিয়ে রুদ্রেনের মা বোধ হয় ঘাড়ের জ্বালা কমালেন।

নবাগতা কৌতূহলী হলেন—"চলুন না, দেখে আসি আপনার ননদকে।"

"বেশতো, চলুন না। লোক দেখলে ও খুশীই হয়।"

দোতলায় উঠে এলেন দু'জনে। একফালি ঘর—বাক্স বললেই ঠিক বলা হয়। তক্তপোশের শয্যায় বসে আছে একটি শীর্ণ দুর্বল মূর্তি। চোখ দুটো জলছে রোগা মুখে। বৌদির সঙ্গে নবাগতাকে দেখে ভয় পেল—"ও কে, বৌদি?"

"ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ঠাকুরঝি।"

মুহূর্তে সে খুশী হয়ে উঠল—ময়লা বিছানা ঝেড়ে বলল, "বসুন না। দেখেছ বিছানাটা কি ময়লা হয়ে গেছে। চাকর-বাকর আমার কথা শোনে না। তুমি একটু বলে দেবে, বৌদি, পরিষ্কার করতে?"

বিছানার দিকে না চেয়েই ঔদাস্যভরে বৌদি বল্লেন, "আচ্ছা।"

কিছুক্ষণ দিব্যি স্বাভাবিক কথাবার্তা চলল। বাজারদর, আবহাওয়া ইত্যাদি। নবাগতার মনে হ'ল এমন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতির দোষ দেওয়া হয় কেন?

সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "দেশ কোথায় আপনার? কলকাতারি লোক নাকি?"

"না ভাই, চাকুরির জন্য এখানে থাকা। দেশ আমার পাকিস্তানে।"

"কোথায়, কোথায়?" লাল হয়ে উঠল মুখ ওর, চোখে জ্বালা দেখা গেল। বৌদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কোথায় আবার? ও কথা থাক। শোন ঠাকুরঝি, পিয়ন আজ তোমার নামে চিঠি আনবে বলেছে।"

বৃথা চেষ্টা। ততক্ষণে দেহ তার থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। উঠে দাঁড়িয়ে ভীতা নবাগতার হাত হাড়সার আঙুলে চেপে ধরে প্রশ্ন করল সে, "তাহ'লে, আপনি কি তাদের চেনেন?"

"কাদের আমি চিনব?"

"কেন, আপনি জানেন না? সবাই যে জানে। আমাকে যারা চুরি করে

নিয়েছিল ?" কাতরকণ্ঠে কেঁদে উঠল সে—ফুঁপিয়ে উঠে বিছানার ওপরে লুটিয়ে পড়ল। কে যেন অতর্কিত আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছে ওকে।

হ্যাঁ, ও—ময়না।

এই ময়নার ইতিহাস, অকথিত। নারীহরণ চলতি হ'বার মহাযজ্ঞের অনেক পূর্বে জীবনে বিয়োগান্ত নাটিকা অভিনীত হয়ে গেছে ময়নামতীর। তাইতো ট্র্যাজেডি। পরে যা প্রচলিত হয়ে লঘুত্বে পর্যবসিত হ'ল, পূর্বের গুরুত্বের ভার তাই চাপাল ময়নার মাথায়। বেদনা-পাণ্ডু জীবনে মার্টার হ'বার গরিমাটুকুও ছিল না ময়নার। ও হয়েছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনার পুরোধা মাত্র। ওর ইতিহাস লিখিত হ'বার বহু পূর্বে ওর ঘটনা ঘটে গেল। তখন নেতারা বিচলিত হয়ে পল্লীগ্রামে ছুটে যাননি। প্রেসের রিপোর্টার হানা দেয়নি। সর্বতোশুদ্ধির বিধান দিয়ে পণ্ডিতমশাই আত্মপ্রসাদ লাভ করে উঠতে পারেন নি। বড় ইতিহাসে যুক্ত হয়ে ছোট ঘটনার মূল্য ভিন্ন রূপ নিতে পারলে কই তখন? শুধু ময়নার দুঃখ ইতিহাসের আড়ালে সর্বংসহা মাটির বুকে একবার গেঁথে গেল পল্লীদুহিতার চিরন্তন দুঃখ, বাংলার মেয়ের জীবনের মাথুরপালা। চাইনা, ফিরে যেতে ওখানে। শহরে অনেক কিছু গোপন রাখা চলে। শহর অনেক কিছু জানতে পারে না জনতার ভিড়ে। শহর অনেক জেনে চুপ করে থাকে নীরব ক্ষমায়। শহরে পল্লীসমাজ নেই।

কিন্তু, সেই সমাজ যখন বিধান দিয়েছিল, তখন সমস্যা ছিল গ্রামে। সে সমস্যা পল্লীর সমাজে বিকৃত রূপ ধরে তবে এল শহরে। সমস্যা চলে গেল সমাজ থেকে—কিন্তু একজনের জীবন তো সমস্যা হয়েই রইল। ঘটনাটা ক্ষণস্থায়ী, পরিণাম দীর্ঘ।

দয়ার চাল কাঁড়া-আকাঁড়া বাছা চলে না। ভিক্ষার রুটী জিহ্বায় তিক্ত লাগে। মা-বাবা নেই। স্বামী-পুত্র হ'ল না। তবু তো প্রয়োজন জীবনধারণের, আহার্যের। ক্রমেই শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে ময়নার। একবার ডাক্তার দেখানো হয়েছিল অবশ্য। ডাক্তার রায় দিয়েছিলেন যে, মনের মধ্যে চাপা দুঃখ ও ভয় এমনি স্বাস্থ্যহানি করেছে। মন প্রফুল্ল রাখা, বায়ুপরিবর্তন হ'লে সারতে পারে। কে করবে ব্যবস্থা? মধ্যবিত্ত ঘরের চিরকুমারী। তার মা-বাবা

নেই। তার জন্য কার মাথাব্যথা! একটা টনিক এল শুধু। পরে তা-ও না।

বড়দা ছেলেমেয়ে নিয়ে অর্থাভাবে বিব্রত। উদয়-অস্ত পরিশ্রম। কঠোর হয়ে গেছে মন। সন্দিগ্ধ হয়েছে চিত্ত পারিবারিক দুর্ঘটনায়। সহোদরা অপহৃত হবার পরেই তাঁর মনে এসেছে নানা কম্‌প্লেক্স্‌। বড় মেয়ে মালতী বি-এ পড়ে। চেষ্টা চলছে বিবাহের। ছেলে-মেয়ে আধুনিক। পিতার দৃষ্টির বাইরে একটা মনোমত গোপন জীবন কাটায় তারা। ধরা পড়লে রক্ষা থাকে না।

তবু ময়নার খাওয়া-পরার কষ্ট ছিল না। বঞ্চিতা হতভাগিনীর জন্য হয়তো সহোদরের মনের কোণে একটু স্নেহ ছিল। কিন্তু, খাওয়া-পরা ছাড়া যে মানুষের আরও অনেক কিছু দরকার হয়।

একা-একা দুর্বহ জীবন। কোণের ঘড়ে পড়ে থাকে। কর্মব্যস্ত বৌদি ঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও ননদের ঘরে ঢোকেন না। অসুখ করলে দেখাশোনা করতেই হয় অবশ্য। তবে, অসুখ তো লাগাই আছে। চুপ্‌চাপ্‌ ময়লা বিছানায় শুয়ে কত কি ভাবে ময়না। আকাশের তারা গোণে। অহরহ এককালে কেঁদে কেঁদে চোখের মাথা খেয়েছে ও। মাথা ধরে থাকে। দুর্বলতা হেতু বলে চোখে চশমা ওঠেনি। দিনে একটু পড়তে পারে। ছেঁড়াখোঁড়া মাসিক হাতে পড়ে বই কি। রাত্রে পড়াশোনা চলে না। তাছাড়া, জ্ঞানার্জনের স্পৃহাও নেই ময়নার। সুতরাং, একাকীত্ব তার বড় ভয়ানক। বড় ভয়ানক।

সে একাকীত্ব রাত্রির প্রহরে বক্ষে শ্বাসরোধ করে বসে। ঘুম হয় না তার আজ পনরো বছর ভাল। সারা কালরাত্রি কালো মুখোসে মুখ ঢাকে। ময়না চমকে ওঠে। বহু পুরাতন কাহিনী ফিরে আসে মনে। চীৎকার করে কোনদিন কেঁদেও ওঠে। কিন্তু, স্নেহপ্রবণা কোন মাতা আর তার ঘরের দরজা ঠেলে অপরাধী চোরের মত কাছে এসে বসেন না। রাত্রির মত নিঃসঙ্গ ময়না। রাত্রির মত অন্ধকার তার জীবনে।

সকালে চাকর ঘরে চা-রুটী রেখে যায়। ঠাণ্ডা বিস্বাদ চা। সারাদিন কাটে ঘরে। শুধু স্নান করে খেতে নীচে যায় একবার। রাত্রে অর্ধেক দিন

ক্ষিধে হয় না। এজমালী রান্না মুখে রোচে না। উপোসে কাটায় রাত ময়না। কদাচিৎ ভালমন্দ জোটে।

লোকের চোখের আড়ালে অস্তিত্ব যার, তার সম্বন্ধে মনোযোগী কেউ হয় না। সে কাউকে বেগ দেয় না, কিছু চায় না। তার নম্র-ব্যঞ্জক উপস্থিতি তো সকলে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছে। কেউ ভেবে দেখেনি, ময়নার একটু ভাল লাগবে কিসে।

ছোটভাই বিদেশ থেকে টাকা পাঠাত কখন। সে টাকায় ময়না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বিস্কিটের টিন, লজেন্সের শিশি কিনে আনত। যখন ক্ষিধে পেত খেত টুক্‌টাক্ করে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ ছিল ভিন্ন।

প্রাণস্রোতে ভাসমান বাড়ী। বড়দার অনেক ছেলেমেয়ে, নানা বয়সের। দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি করে বাড়ীখানা মাথায় তুলে রাখে। আত্মীয়-স্বজন, দাদার শ্বশুরবাড়ী, প্রতিবেশী-আনাগোনায় মুখরিত বাড়ীখানা। ময়না কিন্তু নিঃসঙ্গ।

বড় ইচ্ছা করে বাচ্চাদের সঙ্গে মেশে সে। কাছে এনে আদর করে। বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে একটুক্ষণ। কিন্তু আসে না তারা। ময়নার গলা ক্ষীণ হয়ে গেছে। তীক্ষ্ম-সরু গলায় বাচ্চাদের ডাকাডাকি করে ময়না। মুখ তুলে দেখেও না তারা, নিজেদের পথে চলে যায়। কখনও বা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়। মা বা বড়বোন কোন নির্দেশ দেন না তাদের। অত্যন্ত অবজ্ঞেয় মানুষ পিসী। যাবার জায়গা নেই কোথাও। স্বাভাবিকত্ব সর্বদা থাকে না। রুগ্না-ধর্ষিতা। লজ্জার কথা এমন পিসী থাকায়।

তবে খাবার-পত্র দিয়ে লোভ দেখালে তবুও আসে বাচ্চারা। ক্ষীণ গলা তুলে ময়নামতী ডাকে—কেঁপে ওঠে স্বর—"বুবুল, এই মণি! লজেন্স দেব, আয় না একটু।"

সব সময় থাকে না এসব। বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে জানালার শিক ধরে ময়না নীচে চেয়ে থাকে, "এই এই," বলে ডাকে। ফল হয় না।

মালতীর যমজ ভাই সুদেব দোতালার বারান্দায় মাঝে মাঝে গানের আসর বসাত। ময়না আস্তে একধারে যেত বসতে। অস্বস্তি বোধ করলেও আধ-পাগলা পিসীকে উপেক্ষা করা চলে। কয়েকটা দিন কেটে গেল বেশ।

বাড়ীতে ময়নার প্রতি তো কোন অত্যাচার নেই, আছে অবহেলা। যদি কখনও বেশী কান্নাকাটি বা চীৎকার করে ফেলত, তা'হলে এক বড়দা এসে ধমক দিতেন। অন্য কেউ কিছু বলত না। তাদের কলহ, ক্রোধ ছিল না। থাকলে হয়তো নিরবচ্ছিন্ন ঔদাস্যের চেয়ে ভাল হ'ত।

আজও ময়না সান্ধ্য-আসরের এক কোণে বসেছে। সুদেব ও মালতী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাধবী মেজ, সে গান গাইতে গাইতে ভ্রূকুটী করল।

বাইরের মাসতুতো, জ্যেঠতুতো এসেছে কেউ কেউ। চা চলছে। বুবুল বলে উঠল, "পিসীকে দিলে না, দিদি?"

মালতী এক কাপ চা সামনে নামিয়ে রাখল। ময়না এক চুমুকে শেষ করে শান্তি পেল। মাথাধরায় এ সময়ে এক কাপ চা পেলে তো ভালই লাগে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ—তেমন চা-পানে অভ্যস্ত নয়।

আকাশে আজ শ্রাবণ পূর্ণিমার রাত। ঝুলনের চাঁদ মেঘের দোলনায় দুলছে, দুলছে অগণিত তারা, চাঁদের আভা ম্লান। আজ রাত নয় একা কাটাবার। জ্যেঠতুতো ভাই একজন বন্ধু এনেছে। কর্তা তেতালায় অফিসের ক্লান্তি নিয়ে বিশ্রাম করছেন। বাইরের কেউ এসেছে এ খবর রাখেন না।

সুদর্শন তরুণ। কোঁকড়া চুলে ঢাকা মাথা। গলায় গানের সুর। মালতীর সঙ্গে নিবিড় হয়ে গল্প করছে। মাধবী গাইছে—

"ও কেন গেল চলে
কথাটি নাহি বলে,
মলিনমুখী, আঁখি ভরিয়া নীরে?"

হয়তো মৌনা ময়নামতীর মনে পড়ে গেল অমলকে—অতীত অগ্রহায়ণে যার গৃহলক্ষ্মী হ'ত সে। আজ এমনি উৎসব-প্রাঙ্গণে উপেক্ষিতা তা'হলে হ'ত উৎসবের কেন্দ্র। লাল শাঁখার পাশে সুগোল হাতে ঝল্‌সে উঠত কঙ্কণ, চূড়, বালা। শরীর ঘিরে জ্বলত তারাঘেরা নীলাম্বরী ঢাকাই। কালমেঘচুলে লাল বিদ্যুৎ সিন্দুরবিন্দু। এমনি ছেলেমেয়ে তারই থাকত—থাকত সঙ্গী, নিজের ঘর।

গান শেষ হ'তে সুদেব বলে উঠল, "কি দারুণ চাঁদ উঠেছে আজ।"

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় বেজে উঠল, "চাঁদ উঠেছে কেন? চাঁদ আমার শত্তুর। আমার সর্বনাশ করতে উঠেছে।"

স্তব্ধ হয়ে গেল আসর। পিসী বহুদিন তো শান্ত ছিলেন। আবার আজ অতর্কিত পাগলামী সুরু হয়ে গেল। এতগুলি লোকজন এসেছে। কি করা যায়?

মালতী ছুটে এসে হাত ধরল, "চলুন পিসী, ঘরে দিয়ে আসি।"

"না, না,"—হাত ছিনিয়ে নিল ময়না, "ঘরে যাব না। ঘরে আমাকে একা রেখে সবাই ফুর্তি করবে, না? একা একা আমার ভয় করে। সারা জগৎ যে আমার শত্তুর। তবে আসবে, চিঠি আসবে। আমাকে খবর দেবে সে। মজা করে চলে যাব আমি। দেখা করে নিয়ে যেতে লোক আসবে।"

মালতী কাঁদকাঁদ হয়ে ধাক্কা দিতে লাগল, "পিসী, চুপ করুন। ঘরে চলুন।"

ইতিমধ্যে রুদ্রেন ওপর থেকে পিতাকে সুপ্তিভঙ্গ করে ডেকে এনেছে।

গানের আসর দেখেই কর্তার গা জ্বলে গেল। তায়, বোনের এমন কেলেঙ্কারী! রুক্ষভাবে ধমক দিলেন, "ঘরে যা, ময়না।"

"না, আমি যাব না কিছুতে।"

কে যেন হেসে উঠেই থেমে গেল। বড়দা ময়নার হাত চেপে অতি রূঢ়ভাবে টেনে নিয়ে চললেন—"এখানে ছোটদের মধ্যে বুড়োধাড়ী আড্ডা না দিলে চলে না? ঘর দিয়েছি। খাও, দাও, ঘুমোও। না, কালোমুখ লোকের সামনে বা'র না করলে চলে না, না? এই আমার হুকুম, আজ থেকে তুই ঘর থেকে বেরোবি না।"

ময়নার হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ির পাশে কাঁচের চুড়ি ছিল। বড়দার হাতের চাপে ভেঙে গেল। মাংসে গেঁথে গেল টুকরো।

"উঃ, আঃ," করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল ময়না। শান্ত হয়ে গেছে সে। শুধু চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

"উ-আ করলেই ছাড়ব কিনা! যত ভোগ হয়েছে আমার কম্মে। ওধারে ছকুবাবুরা গাওনা-বাজনা করবেন আড্ডাখানা খুলে। এধারে এই পাগল। সারাদিনের খাটুনি খেটেও শান্তি নেই।"

সজোরে গলা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বড়দা ময়নাকে ঠেলে তার খুপরীতে ফেলে সজোরে দরজার ছিট্‌কানি দিলেন।

রুদ্রমূর্তি পিতার ভয়ে সবাই সরে যাচ্ছিল। নূতন লোক দেখে কর্তা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ইনি কে? আগে তো দেখিনি।"

সুদেব কম্পিত স্বরে বলল, "ননীদার বন্ধু।"

"ননীর বন্ধু? তা, আমার অন্দরে কেন? মালতী, তেতালায় এক্ষুণি চলে এস।" কর্তা শেষ ঘা হেনে চলে গেলেন।

অলক্ষিতে যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, তা'হলে হয়তো সেদিন তাঁর নিষ্কম্প শুষ্ক চোখের অক্ষিপল্লবের একটুকু প্রান্ত সজল হয়ে উঠেছিল, বন্ধ ঘরের অন্ধকারে নিরপরাধিনীর শাস্তি দেখে। কিন্তু, না, হয়তো ও মরুচোখে করুণার শ্রাবণ এখনও ঘনায়নি। তা'হলে তো আমরা বাঁচতাম। আমরা বেঁচে যেতাম।

ময়নার কাটা হাতের জন্য একটু জ্বর হল। অনুতপ্ত বড়দা আয়োডিন প্রয়োগে তাকে—নিরাময় করে তুললেন। অফিস-ফেরৎ এক শিশি হরলিক্স কিনে আনলেন।

কিন্তু, বদলে গেল ময়নামতী। তার সমস্ত প্রতিরোধ যেন ভেঙে পড়ল। আগে ক্ষীণস্বরে বাচ্চাদের ডাকাডাকি করত। বাইরের জগৎ তাকে ত্যাগ করলেও গায়ের জোরে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ রাখতে চাইত সে। অনিচ্ছুক চাকরকে ডেকে ঘরের ময়লা সাফ করাত। বিকেলে চুল আঁচড়াত। সব গেল তার। পাগলামিও দেখা দিল না আর। হয়তো বড়দার অমন ব্যবহারে চমকে গিয়েছিল। হয়তো বা সেদিন বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ভয় পেয়েছিল। চুপ করে গেল ময়না।

দিনরাত ময়না ছোট বিছানাটিতে শুয়ে পড়ে থাকত। ঠাকুর খাবার সময়ে দরজায় উঁকি দিয়ে তাগিদ দিত, "ও পিসীমা, উঠে চান করে খেয়ে নিন। হেঁসেল আগলে থাকি কতক্ষণ?"

উঠে যা পারে খেয়ে আবার ছড়ানো শয্যার অযত্নের মধ্যে শুয়ে পড়ত ময়না। রাত্রে খাবার সাধও চলে গেল তার। বৌদি বার্লি করে বা সাবু রেঁধে পাঠাতেন। একদিন ঘরে ঢুকেও পরীক্ষা করে দেখলেন যে জ্বর হয়নি। ছেলেপিলের বাড়ী, সাবধান হ'তে হয় তো। পাগলামির নূতন লক্ষণ ময়নার নিশ্চেষ্টতা ভেবে সকলে নিশ্চিন্ত রইল। ধীরে ধীরে ময়নার শরীর বিছানায় মিশে যেতে লাগল।

মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে বড় নির্মম—তার আগমনে নয়, অদর্শনে। চল্লিশের

নীচে বয়স ময়নার। মৃত্যুর পায়ের পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। কিন্তু, এখানে দ্রুতগতি হ'ত মমতার রূপ মাত্র। মৃত্যুকে নির্মম কেউ বলতে পারত না।

আধো আলো, আধো অন্ধকারে ময়না মলিন বিছানায় শুয়ে আছে। বাক্সের মত ঘরে একটি মাত্র দরজা, জানালা। অমাবস্যার আকাশে কত তারা গুণে দেখবার চেষ্টা হয়তো করছিল ময়না। চোখের কোণ দিয়ে জল ঝরে পড়ছিল ছিন্ন বালিশে। দেখার লোক নেই কেউ। বিকেলের চা খেয়েছে। রুটি পড়ে আছে অনাদরে। রোগীর রুচিমত আহার যোগায় কে? তার মা নেই, বাবা নেই। অনাথা, গলগ্রহ চিরকুমারী।

একটা তীব্র কলহ শোনা গেল। মালতীর বাবা ক্ষেপে যেয়ে এর মধ্যে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন দোজবরের সঙ্গে। হয়তো তাই নিয়ে কলহ।

ময়নাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কিছু। ছিন্ন বিছানায় জীর্ণ শরীর নিয়ে তবু উঠে বসল সে।

মালতী ছুটে এল। অন্ধকার ঘরে দরজা ভেজিয়ে চির-অনাদৃতা পিসীর গা ঘেঁসে দুর্গন্ধ শয্যায় বসে বলল, "চুপ করে থাকুন, পিসী। এ ঘরে লুকোলে বাবা খুঁজে পাবে না।"

ময়না থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। শীতে সারা দেহে ঘাম ঝরছে—"কি হ'ল? কি হয়েছে? তোকেও কি চুরি করে নিতে এসেছে?"

তার ঘরে সৌখিন ভাইঝি মালতী? কি ব্যাপার?

মালতী বিরক্ত হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "জ্বালা হয়েছে! শুনুন, সত্যি কথাই বলি। বাবা সামনের মাসে বুড়োর সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছেন আমাকে। কিন্তু আমি বিয়ে করব সেই ছেলেটিকে, যে ঝুলনের দিন দোতলায় এসেছিল। আমি চিঠি লিখেছিলাম ওকে। রুদ্রেন নিয়ে যাচ্ছিল, বাবা ছিনিয়ে নিয়েছেন। রুদ্রেন পালিয়ে গেছে মাসীর বাড়ী। বাঁ-হাতে লেখা চিঠি আমার। তবু, বাবা তাড়া করেছেন।"

বিলুপ্তপ্রায় বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ময়না ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। সুপ্তির সমুদ্রে ডুবে ছিল ময়নামতী। দেহমন নিশ্চেষ্টতার পাথারে মগ্ন ছিল।

দীর্ঘ এতদিন পরে, অযুত-অযুত বৎসর পরে, তার কাছে আশ্রয় চায় কেউ। তার মত জঞ্জালেরও প্রয়োজন আছে জগতে। তাকে দিয়েও কাজ হ'তে পারে!

দরজা ঠেলে ক্রুদ্ধ বড়দা ঢুকলেন। খট্ করে জ্বলে উঠল আলো। "এখানে এসে ভাবছ খুঁজে পাব না? ময়না, ছেড়ে দে ওকে। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দি।"

ময়না অতিকষ্টে কাঁপুনী থামিয়ে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

"হয়েছে আমার মুণ্ডু। তুমি যে বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছ। বিবিজী চিঠি লিখেছেন, রাত বারোটায় দেখা করতে ননীর সেই বন্ধুটাকে। আঁকাবাঁকা লেখা লিখে ভাবছে হাতের ছাপ লুকোবে। আরে, তুই ছাড়া এ চিঠি কে লিখবে? মাধবী তো মামার বাড়ী তিনদিন ধরে রয়েছে।"

"আমি লিখেছি ও চিঠি।"

"তুই লিখেছিস! ময়না?"

"হ্যাঁ, আমিই লিখেছি,"—স্বাভাবিক সুস্থ স্বর ময়নার—"ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছিল।"

জ্যেষ্ঠ অবাক হয়ে চাইলেন—শীর্ণা-বিগতযৌবনা চিরকুমারী। বিকৃত তার বুদ্ধিমানস। সে লিখবে প্রেমপত্র? এতই পাগলামি বেড়েছে?

মালতীর মুষ্টি শিথিল করে আস্তে বিছানায় এলিয়ে পড়ল ময়নামতী। উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তার কপোলে ফুটে উঠেছে লাল ঝুমকো জবা, একদা যে জবার দেশে ছিল সে। চোখে তার আবার লেগেছে পদ্ম-দিঘীর স্বপ্ন। ভুলে-যাওয়া দূর দেশ তার।

মনে পড়ে গেল বড়দার। আশ্চর্য কি? প্রেমপত্র এখনও ময়না লিখতে পারে। মনে পড়ে গেল, একদিন গাঁয়ের সেরা সুন্দরী ছিল ময়না। সুদেব ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেল। অবজ্ঞেয়া, বঞ্চিতা, চিরকুমারী তবু জীবনের শেষে একটা কাজ করে গেল। সে-ও কাজে লাগল অবশেষে।

না, রাজা গোপীচন্দ্রের মাতা রাণী ময়নামতীর রূপকথা নয়। প্রাচীন বাংলার ধর্মমঙ্গল নয়। সাধারণ পল্লীদুহিতা ময়নার কাহিনী। লিখছি আমি, সাধারণ ব্যক্তি।

লিখছি আমি, নিরাসক্ত নির্বিকার চিত্তে, টেবলে আলো জেলে। কিন্তু আকাশে উঠছে সর্বনাশা ঝড়।

হয়তো ঝড় উঠবে। সব ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নূতন প্লাবনে। ঝড় আকাশে বেগ সঞ্চিত করছে অপেক্ষায়।

এমনি কাহিনী কল্পিত নয়—জীবনের পৃষ্ঠার ইতিহাস। দিনের পর দিন চলেছে এমন কাহিনীর রূপায়ন। ঝড় তবু অলক্ষিতে নিজ গতি বৃদ্ধি করে চলেছে।

আজ আমি লিখছি কালি দিয়ে। এমন কাহিনী কাল ক… ।আর ।আজ লিখছি আমি। কিন্তু আমি যদি—আমি যদি— রক্ত দিয়ে লিখ… যদি আমার সঙ্গে সারা কলকাতা কাঁদত!

…াদের পরিচালকের

। লুক্কায়িত মুখ। যৌবন

…ণ নিয়ে টানাটানি; হয়তো

…এ যখন ব্যঞ্জনা তার। চিত্রা, চিত্রা! মনের

। চিত্রা! চিত্রা! অনামিকায় ফিরোজার

…রেশম গায়ে। পায়ে সোনালী আধুনিক স্যাণ্ডেল—আর

।

…র মুখে কত কি দিচ্ছে চিত্রা—কত আয়াস বলিচিহ্ন বিলুপ্তির। …বা পাউডারে চলবে না। বার হ'ল সোনালী বাক্সে 'এঞ্জেল্ ফেস্', …টিস্যু, বার হ'ল রুজের তুলো। বিরলকেশে নকলচুলের 'সুইচ' দিয়ে …। চিত্রা আধুনিক মুকুটের মত কবরী। বদলেই গেল সে প্রসাধনান্তে। চোখের নীচে ওই যে বায়সপদলাঞ্ছিত দাগ—কিসে ঢাকবে তাকে?

বস্‌বার ঘরে দিনের আলো প্রবেশ করেনা—ডবল নিননের পরদায় সমস্ত …নালা ঢাকা। আলোর সেখানে ঘসা কাঁচের মধ্য দিয়ে ক্ষীণদ্যুতি প্রকাশ। স্বামিনীর রূপে প্রেতচ্ছায়া ধরা পড়ে না। অনেক ব্যথার শেষে থাকে সহনশীলতা, অনেক রূপের ধ্বংস একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবার আগে দাঁড়ায় বুঝি কিছুক্ষণ। আমার চোখে যাকে বিগতা মনে হয়; কোন পরিচালক হয়তো এখনো তাঁকে বসন্তদেবী মনে করেন।

তার বয়স পঞ্চাশের কাছে, ঠিক আমি জানি না। শুধু জানি তার বিচিত্র জীবনের কতকগুলি বিচিত্র বৎসর। কয়েকটি ঘটনার আভাস জানি, কিছু অভিজ্ঞতা। তোমাকে তাই শোনাই, এস।

হ্যাঁ, উনি চিত্রতারকা, তাই এত বয়সে এত প্রসাধন-চাতুর্য ওঁর। পূর্বে বহু অমর কাহিনীর অমরী নায়িকা। আজ সে হৃতশ্রী-বিলুপ্তির পূর্বের অবস্থা। নায়িকার ভূমিকায় শেষ হয়ে গেল অভিনয় তার—দূরাভিসারিকার দরজায় বন্ধুর রথ থামার পূর্বেই বন্ধুর পথে থেমে গেল সে। সে আমার বিগতজীবনা উর্বশী। ভীনাসের মত সমুদ্র-উত্থিতা, বাসনার সমুদ্র। আজ নিভে যাবার পূর্বের কয়েকটি দিন তার। আহা!

প্রযোজকের সঙ্গে এখনও খাতির আছে। আছে সমাদর পরিচালকের কাছে। টাকা আসছে এখনও। রঙের অন্তরালে লুক্কায়িত মুখ। যৌবন সুদের কারবার শেষ করে দিয়েছে তার। আসল নিয়ে টানাটানি; হয়তো আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

চিত্রা নাম তার ধরে নাও, চিত্র যখন ব্যঞ্জনা তার। চিত্রা, চিত্রা! মনের কানে কানে শোনা গান যেন। চিত্রা! চিত্রা! অনামিকায় ফিরোজার আংটি, ফিরোজা সূক্ষ্ম রেশম গায়ে। পায়ে সোনালী আধুনিক স্যাণ্ডেল—আর একটি অলঙ্কার যেন।

বারে বারে মুখে কত কি দিচ্ছে চিত্রা—কত আয়াস বলিচিহ্ন বিলুপ্তির। ফাউণ্ডেশন বা পাউডারে চলবে না। বার হ'ল সোনালী বাক্স 'এঞ্জেল্ ফেস্', বার হ'ল টিস্যু, বার হ'ল রুজের তুলো। বিরলকেশে নকলচুলের 'সুইচ'' দিয়ে বাঁধলো চিত্রা আধুনিক মুকুটের মত কবরী। বদলেই গেল সে প্রসাধনান্তে। কিন্তু চোখের নীচে ওই যে বায়সপদলাঞ্ছিত দাগ—কিসে ঢাকবে তাকে?

বসবার ঘরে দিনের আলো প্রবেশ করেনা—ডবল নিননের পরদায় সমস্ত জানালা ঢাকা। আলোর সেখানে ঘসা কাঁচের মধ্য দিয়ে ক্ষীণদ্যুতি প্রকাশ। স্বামিনীর রূপে প্রেতচ্ছায়া ধরা পড়ে না। অনেক ব্যথার শেষে থাকে সহন-শীলতা, অনেক রূপের ধ্বংস একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবার আগে দাঁড়ায় বুঝি কিছুক্ষণ। আমার চোখে যাকে বিগতা মনে হয়; কোন পরিচালক হয়তো এখনো তাঁকে বসন্তদেবী মনে করেন।

চিত্রা বিবাহিতা হয়েছিল নামতঃ। অত্যাচারী স্বামীর অত্যাচারের বাইরে চিত্রে আশ্রয় নিয়ে নাম বদলে নূতন জীবনে জেগেছে সে। ঘরে নেই রক্ষক। বাইরের ভক্ষক আসা বন্ধ হয় না। হ'লেও বহুক্ষেত্রে চিত্রার চলে না। অতএব চিত্রা স্বাধীনা।

কিন্তু, বড় যে একা লাগে। চল্লিশ পর্যন্ত চলেছিল। উদ্ধত যৌবন জয়পতাকার মাহাত্ম্যে অসামান্যা করেছিল নটীকে। চোখে-মুখে অপার্থিবতা লেখা ছিল, মাদকতা ছিল ভঙ্গীতে। শেষ হয়ে যাচ্ছে পদ্মিনীর মধু, মধুপ-গুঞ্জরণ থেমে গেল বুঝি। ওই ঘরের কোণের ষ্ট্যাচু, খেয়ালী শিল্পীর সৃষ্টিমাত্র, যাকে অর্থ দিয়ে কিনে এনেছে চিত্রা, সে রইল অচপল যৌবনমণ্ডিতা, তেমনি শাশ্বতী, শুধু চিত্রার হ'ল পরিবর্তন ?

একদা বৈষ্ণবজনোচিত ভূমিকায় কীর্তনকণ্ঠে প্রৌঢ়বৃন্দকে কাঁদিয়েছিল চিত্রা। সেই গান মনে এল, মহাজনের পদ—

"অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব,
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গমাওব,
কি করব সো পিয়া নেহে॥"

নবযৌবন কেটে গেল খ্যাতির বালুচরে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে। একের পর এক ছবি হচ্ছে। রিহার্সেল্, শুটিং, আউট্‌ডোর্। গানের অভ্যাস করা। আর, রূপযৌবন বেঁধে রাখবার দুরন্ত প্রচেষ্টা।

এসেছে দ্বৈত জীবনে—ত্রস্ত পায়ে শয়নগৃহ থেকে বা'র হয়ে গেছে কোন পুরুষ ভোরবেলায়। কিন্তু, প্রেম ? কোথায় সে ? কোথায় ?

ঝি খবর দিল, "যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনি এসেছেন।"

বসবার ঘরে আলো পেছনে রেখে বসল চিত্রা। আতিথ্যের আয়োজনে পরিতৃপ্ত যুবক রঞ্জন মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "আজ কয়েকটি নূতন কবিতা এনেছি।"

সুরু হয়ে গেল অভিনয়। প্রেক্ষাগৃহের ঘণ্টা বেজে উঠল, মঞ্চের পাদপ্রদীপ জ্বলল।

তরুণের প্রেমারতি—শ্রবণের মাধ্যমে। তরুণীকে নয়—প্রৌঢ়াকে। পরিস্থিতি মর্মান্তিক।

চিত্রার মুখে ফুটে উঠল মুগ্ধ বিস্ময়—একখানা হাত উঠে এল গালে—ঝুঁকে পড়ল চিবুক। 'প্রতিধ্বনি' ছবির নায়িকা সাজে যেমন ভঙ্গিতে সে প্রেমিকের গান শোনা দেখিয়েছিল। বহু প্রসাধন-বিধ্বস্ত মুখের কমনীয় রেখাগুলি জাগাতে চেয়ে চিত্রা জাগিয়ে তুলল রুক্ষতা—সাধারণী নারীর বহু অভ্যস্ত ভঙ্গিমা।

কবিতা পড়া হচ্ছে। বাইরে আর্তনাদ করছে উন্মত্ত প্রাবৃট, মেঘের ছায়া জানালার ডবল নিননকে আরও অন্ধকার করে তুলেছে। বৃষ্টিধারা আসছে সারা পৃথিবী ঢেকে। আমার দেশে বর্ষা নামল।

রঞ্জনের কণ্ঠে স্তুতি—ভাষায় স্তুতি। কোন সুন্দরী প্রতিভাকে সে কাব্যছন্দে বন্দনা করছে। তুমি মানুষী, কিন্তু দেহাতীত। স্বপ্নকে তুমি গড়ে তোল শরীরের মাধ্যমে—দেহকে অতিক্রম করে তোমার প্রতিভা। হে চিরনারী স্থিরযৌবনা, অনন্ত তোমার লীলাবিভ্রম। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর।

এমনি ঘটছে দিনের পর দিন। বেকার কবি চায় তার কাব্যের একজন পেট্রন। চিত্রাদেবীর দৃষ্টিপাত হ'লে হয়তো গান লিখবার কাজ পাওয়া যাবে সিনেমায়। আসবে অর্থ, আসবে খ্যাতি।

চিত্রাদেবীর আছে সামর্থ্য। এই বাড়ী, ওই গাড়ী সাক্ষ্য দেয়। এখনও প্রাচীরপত্র উচ্চকণ্ঠে লাল অক্ষরে নাম চিত্রার বলে দেয় নায়িকার ভূমিকায়! দরজায় থেমে থাকে হাম্বার্, বুইক, শেভরলে। টেলিফোনের তারে যাদের গলা চিত্রাকে ডাকে, তাদের দূর থেকে চেয়ে দেখে ধন্য হয় রঞ্জন মিত্র।

রঞ্জন মিত্র! মানসীর প্রয়োজন নেই তার, বহুদিনই মিটেছে। রান্নার হাত মুছে বাড়ীর পাশের বালিকা কবিতা শুনতে আসে রঞ্জনের। ডাগর চোখের কোণায় কাজল মাখানো, হাতে বাহারী কাঁচের চুড়ি, টাইট্ জামার আধুনিকত্ব জানায় যে, শ্রীমতী পথেঘাটে বা'র হয়ে আধুনিক রীতিনীতি রপ্ত করেছেন।

ডাগর চোখে স্বপ্ন কত! "রঞ্জনদা, কি চমৎকার কবিতা যে আপনার। মনে হয়, অন্য দেশে চলে যাই।"

অমন সমঝদার মানসী যে, তার গায়ে নেই এককুটো সোনা! কেরানী

বাবার তৃতীয়া কন্যার ভাগ্যে কাঞ্চন জোটেনি। রঞ্জন চায় তাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে। যদি মাইডাসের স্বর্ণ ফলাবার বর পেত রঞ্জন মিত্র!

ওইখানে বসে আছেন যিনি তরুণীর সাজে, বৃদ্ধত্ব প্রায় তাঁকে গ্রাস করছে। তবু দুরন্ত বসন্ত এখনও পীড়ন করে পুষ্পশরে। তাই রঞ্জন সুযোগ পায়।

চিত্রা ধরা দিতে ব্যগ্র, বোঝে রঞ্জন। বিগতযৌবনার লোলুপতা যুবকের জন্য। আহারের আয়োজনে বিশেষ পারিপাট্য, আপ্যায়নে অতিমাধুর্য। প্রসাধনে ভীনাস লজ্জা পান। আর বোঝার বাকি নেই রঞ্জনের।

সারা মন যেন ঝুঁকে রয়েছে রঞ্জনের কবিতায়। চিত্রাদেবী বোধ হয় ভাবছেন সব কবিতাই তাঁকে উদ্দেশ করে লেখা। তা কি সম্ভব? সর্বনাশ। একটা দু'টো আদাজল খেয়ে লেখা যায়। বাকী সব মিনতির। ব্যাকুল প্রার্থনা মিনতিকে চেয়ে। ঘর বাঁধা চাই যে।

নিশ্বাস ফেলল রঞ্জন। মিনতিকে বিবাহ করা তার স্বপ্ন। কিন্তু, কি খাওয়ানো যায়? চুম্বনে মধু থাকলেও তো খাদ্যপ্রাণ থাকে না। সুতরাং সব কিছু অভিনয়েই প্রস্তুত আছে সে। দয়িতহীনা বহুবল্লভার প্রণয়ীর অভিনয়েও?—কিন্তু উপায় কি! তারপরে মানসা।

"তোমার তনিমার নবনাড়ে
একদা লভেছিনু অবনীরে।
নাই যে পরিমাণ কেমনে করি পান
জীবনমন্থন নবনীরে।"

স্বস্তি-সুখ আসবে আপনি। অভিনেত্রীর সঙ্গে সে আপাততঃ অভিনয় করবে। সুতরাং রঞ্জন অভিনয়ের মাত্রা চড়িয়ে দিল। আমার কাহিনীর এ অংশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলবে।

যাবার আগে আজ কিন্তু রঞ্জন মিত্র নীরবে চলে গেল না। অকথিত বাণী-ভারাকুল দৃষ্টি তুলে চিত্রার রঙীন মুখে তাকিয়ে আধো কম্পিতকণ্ঠে বলল, "আমি জগতকে জানাতে চাই আপনি কী। আমার বড় ইচ্ছে হয় বোদ্ধা লোকের সামনে এ কবিতাগুলো শোনাই।"

চিত্রা নতমুখে বলল, "দেখা যাক।"

ডবল-নিননের ঘরের দৃশ্য এখানেই শেষ হ'ল। চিত্রা দোতালায় চলে এল। রাস্তা পার হয়ে বাস্‌স্টপে যাচ্ছে রঞ্জন, দেখা গেল। চিত্রা জানালার আড়াল থেকে চেয়ে আছে।

কিন্তু, ওর পদক্ষেপে কি শ্রান্তি? কি ক্লান্তি দেহের গতিভঙ্গীতে? যুদ্ধ-শেষে সৈনিকের দারুণ গ্লানি যেন। চিত্রার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ডান হাত তুলে মাথার রগ চেপে ধরে রঞ্জন পার হ'ল রাস্তা। অপ্রীতিকর কর্তব্য অন্তের গ্লানি।

চিত্রা ফিরে এল আয়নার সামনে। সমস্ত মুখে তারও যে লেখা রয়েছে ক্লান্তি। বড়, বড় ক্লান্ত চিত্রা। বড় ক্লান্ত।

দু'ধারেই ক্লান্তি। বয়সের সাহচর্যে তারুণ্যের ক্লান্তি। আবার তারুণ্যকে সহ্য করাই বয়সের শ্রান্তি।

এ অসহ্য। নির্বোধ, ব্যক্তিত্ববিহীন একটি ছোকরা। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ঘুরছে শুধু। আজই তো দিব্যি প্রস্তাব দিয়ে বসল যে, লোক ডেকে আসর করে ওর কবিতা শোনানো উচিত। "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।" কিছু-দিন পরে বিবাহবন্ধা তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে এসে ন্যাকামি করবে—"আপনার প্রতিচ্ছায়া এরই মধ্যে পেলাম খুঁজে।" লাভের মধ্যে দামী একটা গহনা চিত্রার মুখ দেখ্‌নীতে বেরিয়ে যাবে।

তরুণের কথার পুঁজি কোথায়! বিরক্ত লাগে। এতক্ষণ সহ্য করা যায় না। তবু, প্রসাধনে বয়সকে চাপা দিয়ে বসে চিত্রা। তার যে গ্ল্যামর রাখা প্রয়োজন একান্ত। কোন তরুণ চিত্রাকে নিয়ে এখনও কবিতা লিখছে, চিত্রার জনমতের দাবী। নইলে, নায়িকা সাজার মত সাহস কোথায়?

•

চিরকাল কিন্তু আমি ভালবেসেছি একজনকে নয়, জনতাকে। তাদের মতামত, খ্যাতিনিন্দাই ছিল আমার জীবনকে গড়ে তোলার মশলা। আমি মুগ্ধ করতে চেয়েছি জনতাকে। গাড়ী চড়ে যে আসে দরজায় তাকে নয়—অগণিত টম্-ডিক্-হ্যারীকে, পিট্ ও গ্যালারীকে। তাই আমার জীবনে প্রেম এল না। প্রেমের যে প্রয়োজন বিরাট বিভূতির, প্রেম যে স্বার্থপর, সূচ্যগ্র

ভূমি সে অন্যকে দেয় না। জনতার প্রেয়সীকে সে চায় না। সে চায় নিজের বাহুবন্ধনে করায়াত্তা একজন সাধারণ নারীকে। যে প্রতিভা ধরা দিতে জানে না একজন সাধারণ মানুষের কাছে, সে প্রতিভা প্রেম পায় না।

সত্যই, জনতার প্রেয়সী আমি। শুধু হ'তে চাইনি, হয়ে সুখী হয়েছি। এখনও অন্তিম প্রচেষ্টা নিজের আসনের ধৃতিকল্পে। সারা জীবনে আমার জেলে রেখেছি অসংখ্য পাদপ্রদীপ—গৃহের প্রদীপটি শুধু জলেনি।

মনে পড়ে গেল মিষ্টার মজুমদারের কথা—একজন বিপত্নীক প্রযোজক। নীরব প্রতীক্ষায় চিত্রার প্রতিটি চিত্রের রৌপ্য যুগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি চিত্রাকে দেখেন চিরযৌবনা আর্টেমিসের রূপে। চিত্রার নায়িকা সাজায় বাধা পড়বেনা যৌবন শেষ হয়ে গেলেও। তরুণ নন তিনি, তাঁর কাছে তরুণী সাজার পরিশ্রম করতে হ'বে না চিত্রাকে।

কিন্তু, জনতা? ওই ছয়ানা-দশানায় বসে-থাকা, কলেজ পালানো, উড়ন-চণ্ডী ছেলের পাল? ওই হাল্কাপরীর মত আধুনিকী তরুণীর দল? পিট ও গ্যালারী। প্রাণ দিয়ে চিত্রা যে তাদেরি চায়। তাদেরই মতামতে মূল্য আরোপ করেন স্বনামধন্যা চিত্রাদেবী। আর, তারা চিত্রার জীবনের দুরন্ত প্রেম।

প্রতিটি রূপসজ্জায় মনে হয়েছে, এই রূপ জনতাকে কতখানি বিমুগ্ধ করবে? প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয় করেছে চিত্রা সাধারণের হৃদয়বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রত্যেকটি গান চিত্রার পাগল করেছে জনতাকে।

আস্তে আস্তে চিত্রা চুল খুলতে লাগল। নৈশ-ভোজনের সময় হয়েছে, সময় হয়েছে বিছানার। তোয়ালে ও ক্লিন্‌জিং ক্রীম এর সাহায্যে মুখ মুছে ফেলল।

আয়নায় ভীত-ত্রস্ত গতযৌবন একখানি মুখের ছায়া পড়ল। বিবর্ণ মুখে কোন বর্ণ নেই আর। মিষ্টার মজুমদার তাকে নায়িকা করলেও জনতা আর চাইবে না তাকে। প্রেতের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে চিত্রা।

তবে মিষ্টার মজুমদারকে বিবাহ? ঘরণী গৃহিণীর অভিনয়ে বাকী জীবনটি কাটিয়ে দেওয়া? অভিনেত্রীর পক্ষে কঠিন হ'বে না। এইমাত্র বিমুগ্ধা মানসীর অভিনয় সেরে এল চিত্রা। রঞ্জন ভেবেছে চিত্রার বড় ভালো লেগেছে। অসহ্য পীড়াদায়ক ছিল পরিস্থিতি।

কিন্তু, সারাজীবন কি অভিনয় করেই যাবে সে? যদি অভিনয়ই

করে, তবে জনতাকে ছেড়ে চিত্রা কি করে বাঁচে? অভিনয় রক্তে মিশেছে তার। অভিনয় তার রক্তমাংস, তার মজ্জা। বিবাহ পোষাবে না। প্রেম চায় না সে। সে চায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, উত্তাল জনতাকে।

বিবর্ণ, রঙহীন মুখ। রঞ্জন মিত্রের মানসী হওয়া গেল না। নিজে অভিনেত্রী। অন্যের অভিনয় সহজেই ধরা পড়েছে চিত্রার চোখে। ধরা পড়ে গেল রঞ্জন, যে তারুণ্য সুবিধার আশায় হাড়কাঠে নিজের গলা এগিয়ে দিতে পারে।

চিত্রার চোখে জল আজ। সেই জলের ছোঁয়ায় বুঝি পূর্ণিমার আকাশে মেঘ। মানুষের মনের মালিন্যস্পর্শে আজ আমার দেশে মেঘ নেমেছে। যে বয়স নিজের মর্যাদা ভুলে যায়, যে যৌবন অভিনয় করে, তাদের দেশে সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ ওঠেনি।

বিগত বসন্তদিনের বেদনায় আমার গতজীবনা উর্বশীর চোখে জল। আমি তার কণ্ঠের গান আবার শুনলাম—

"অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে? * * *
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব,
কো দূর করব পিপাসা?"

এই গান গ্রামোফোনে, রেডিওতে বাজছে—'রাধা উন্মাদিনী' চিত্রে চিত্রার গান। অগণিত প্রাণ এই গানের দোলায় দুলেছে। দুলেছে কোটি প্রাণে বিরহ-মিলনের ঝুলনদোলা। অপার্থিব যে শক্তি দিয়ে জনতাকে বেঁধে রেখেছিল চিত্রা, সে শক্তি কি নিঃশেষ হয়ে যাবে? চিত্রা বাঁচবে কি নিয়ে? কি দিয়ে চিত্রা জনতাকে মুগ্ধ করবে আর?

হতাশাস্খলিত পদক্ষেপে আয়নার কাছ থেকে সরে এল চিত্রা। একখানি ছবির ওপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—বালগোপাল বিদায় নিচ্ছে যশোদার কাছ থেকে গোচারণে যাবে বলে। প্রসিদ্ধ চিত্রী ছবিখানি উপহার দিয়েছিলেন। চিত্রাকে দেবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সরল চিত্র। কিন্তু, শিল্পী যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বালগোপাল-পুঞ্জ এঁকে।

হঠাৎ অভিনেত্রীর গলায় কীর্তনের পূর্বাভাষরূপে গান ধরা দিল। জন্ম-অভিনেত্রীকে বাৎলাতে হ'ল না। একদা এসব পদ কীর্তনীয়া শিখিয়ে গিয়েছিলেন কর্তব্যপরায়ণভাবে। চিত্রার ভাল লাগেনি।

"এ সব পদে আমার দরকার নেই"—বিরক্ত হয়েছিল চিত্রা।

কীর্তনীয়ার চন্দনলাঞ্ছিত ললাটে প্রশান্তি জেগে উঠল—"তা হোক আমি আমার কাজ করে যাই। একদিন আপনার ভাল লাগবে। এখনও যে সময় হয়নি।"

সত্যই কি জনতাকে ধরে রাখা যায় কেবলমাত্র যৌবন দিয়ে? তাহ'লে, তাহ'লে শার্লি টেম্পল কেন আমেরিকার প্রাণাধিকা হয়েছিল? পূর্ণযৌবনা শার্লি কেন স্থানচ্যুতা হয়েছে? আছে, আরও অনেক আছে। লাস্য-বিভ্রমের ঊর্ধ্বে আর একটি জগৎ আছে।

কি হ'বে অভিনয়ে? সারাজীবনে ক্লান্তি এসেছে। তাছাড়া, জনতা অভিনয় চায়না—চায় জীবন। অভিনয়ে জীবন দেখাতে হয়। স্বাভাবিক, সহজ যা, তাই তুলে ধর।

বিগতযৌবনার এ তরুণীর অভিনয় কেন? বর্ণবিহীনা দাঁড়াক না প্রৌঢ়ত্ব নিয়ে। দেখুক না পরীক্ষা করে এখনও জনতাকে ধরে রাখবার শক্তি আছে কি না?

মনে পড়ে গেল বৃদ্ধ কীর্তনীয়ার প্রশান্ত মুখ—"একদিন আপনার ভাল লাগবে এ সব পদ, মা। ভবিষ্যতের জন্য আপনার গলায় মহাজনের এমন পদ রেখে গেলাম।"

সারামুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চিত্রার। বায়সপদচিহ্ন মিলিয়ে গেল কোমলতায়। সস্নেহ করুণতায় অপরূপ হয়ে উঠল প্রসাধনহীন, বিধ্বস্ত মুখ। ছবির দিকে তাকিয়ে জীবনে প্রথম যশোদার মিনতি চিত্রার কণ্ঠে ফুটে উঠল—

"আমার শপথি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি। * * * *
থাকিবে তরুর ছায়ে, মিনতি করিছে মায়ে,—
পরাণের পরাণ নীলমণি।"

আমার আকাশে মেঘ সরে গেল। আমার দেশে সূর্য উঠল।

পরীক্ষার হলে বসবার যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে এমন করে আর কারুর প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি। প্রশ্নতালিকায় সহজ-শক্ত বেছে নিয়ে উত্তরের সুযোগ পাইনি। কফিহাউসের দোতলার বারান্দায় মুখোমুখী বসে মূর্তিমতী কৌতূহলের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় অনুশোচনার অন্ত ছিল না।

আমার মধ্যে কেমন একটা খেলো সামাজিকতার আধিক্য আছে দেখেছি। হঠাৎ পথে-চেনালোক কুড়িয়ে তাকে নিয়ে অযথা সময় কর্তন করি। গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গ হই, হৃদ্যতায় যেন মাখনের মত গলে পড়ি। সামাজিকতার রুটীতে তুলে নিলেই ধন্য হব। কি করে টম-ডিক-হ্যারীর সঙ্গে টম-ডিক-হ্যারী হ'তে পারব ক্ষণকালের জন্যও, এই আমার দুরন্ত সাধনা। তারপরে হয়তো টম-ডিক-হ্যারী থাকবে পথে পড়ে, দৃষ্টির অগোচরহওয়া মাত্র ভুলে যাব আমি। তবু, দেখা হওয়া মাত্র মাতামাতির শেষ থাকে না।

জনতা-কন্টকিত শ্যামবাজারগামী বাস থেকে নামলাম কলেজ স্ট্রীটে। সেই কলেজ স্ট্রীট। প্রতিভার পলাশী প্রাঙ্গণ। কত প্রতিভা জীবিত থাকে, কত প্রতিভার দিনমণি অস্তমিত হ'ল পাঠকের চাওয়া-না-চাওয়ার মানদণ্ডে।

প্রতিভা দু'শো থেকে আটশো পাতায় বাঁধা প'ড়ে প্রকাশকের ঝক্‌ঝকে কাউন্টারে হাহাকার করতে থাকে—

"শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণেক হেসে,
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে"—

এইখানে আপাতদৃষ্টিতে নির্লিপ্ত ক্রেতা খোঁজে নিত্য-নূতন আবিষ্কার। সার্কাসের অ্যাক্রোবাটের মত প্রতিমুহূর্তে যে লোক যত দড়ির খেলা দেখাতে পারেন, তাঁর তত জয়। জনমানস চায় মারাত্মক খেলা। 'Slow but steady wins the race' অন্তত কলেজ ষ্ট্রীটের মটো নয়।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে যেন কনুইয়ের খোঁচা দিতে দিতে বলে উঠল, "এই, এই!"

চেয়ে দেখি একদা সহপাঠিনী রাধারাণী স্বয়ং। বহু দিন পরে দেখা। সরস কোনদিনই ছিল না রাধা, এখন ভাঁটির টানে অনুর্বর কঙ্করক্ষেত্রে পরিগণিত হয়েছে। এক হাতে বিস্তর বইখাতা ধরা, অন্য হাতে রঙীন দড়ির পরিপূর্ণ থলে ঝুলছে। অগত্যা কনুইর সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই ওর। এতই বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত ও।

চুল টেনে বাঁধা, ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে মোটা কালো ফ্রেমের গোল চশমা। লাট-পাট শাদা মিলের শাড়ী, নীল খদ্দরের জামা, পায়ে বাদামী চটী। অতি-ভব্য, সংযত-বন্ধন, শাসিত দিনযাত্রার ছাপ মুখে চোখে। এই সব মেয়েরাই ভদ্রমহিলা নামের যোগ্য। পথে ঘাটে এদের লোক পথ ছেড়ে না দিলেও অবশ্যই শীষ দিয়ে অভ্যর্থনা করে না। বালিকা-বিদ্যালয় এদেরই পত্রপাঠ নিয়োগ করে। সন্দিগ্ধা পত্নী এমন মহিলাকেই পুত্রকন্যার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী বাহাল করেন স্বচ্ছন্দচিত্তে। পাত্র পছন্দ করুক না করুক, পাত্রের পিতামহী এদের যোগ্যতা স্বীকার করে নেন। এক কথায় এরা যে ভদ্রঘরের মেয়ে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সার্চলাইটের তীব্রতায় চশমার কাঁচ দুটি আমার প্রতি নিবদ্ধ রইল। অপ্রতিভ হয়ে উঠলাম, বললাম, "অনেকদিন পরে দেখা হল। ভাল আছ তো?"

আমার আপাদমস্তকে চোখ বোলাতে বোলাতে রাধা বলল, "হ্যাঁ, বি-এ

পাশ করবার পরে আর দেখা হয়নি। তা, তুমি তো বেশ ভালই আছ, দেখতে পাচ্ছি।"

মরমে মরে গেলাম। রাধার অতি-ভদ্র বেশভূষার পাশে আমার স্যামন-পিঙ্ক ক্রেপ্-ডি-সিন্ শাড়ী, জর্জেটের কাঠগোলাপ জামা যেন আমাকে উপহাস করে উঠল: এক বয়সী তোমরা। দেখতো ওর দিকে, আর নিজের দিকেও দেখ। পড়ে মরতে বুড়ো বয়সে সিনেমা তারকার সাজ কেন? বলি, লিপষ্টিক মাখাই বা ছাড়বে কবে? কলেজ ষ্ট্রীটে তুমি কতটা বেমানান, জানো কি?

ভাবলাম, সত্যই তো। কিন্তু এসব বেশভুষায় এত অভ্যস্ত আমি যে অভাবে মন খারাপ হয়ে যায়। জুতো ব্যবহারের মত এসেন্স ব্যবহার মজ্জাগত হয়ে গেছে। নাঃ, নিজেকে সংশোধন করা উচিত।

আপাততঃ, রাধার দৃষ্টিবাণ এড়াতে হৃদ্যতায় বিগলিত হয়ে উঠলাম। শ্রম-কঠোর—ঘর্মাক্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম, "এতদিন পরে দেখা। এত ভিড়ের মধ্যে কি কথা হয়? খুব ক্লান্ত দেখছি তোমাকে। এস না কফি হাউসে।"

"স্কুলে পড়িয়ে স্কুল থেকে ফিরছি সোজা। তা, ওখানে কি যাওয়া উচিত?" সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে রাধা আমার দিকে তাকাল।

রাধার বাধা অনুভব করে বললাম, "আরে, সে ওপাড়ার কফি হাউস। এখানে শুধু ছাত্র ছাত্রী আর সাহিত্যিকের ভিড়। তাছাড়া, যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে। আমি নিশ্চয় তোমার কাছে পরপুরুষ নই।"

রাধা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "তবে চল, এত করে বলছ যখন।" রাস্তা পার হ'তে হ'তে নিজের মনকেই প্রবোধ ছলে যেন সে বিড়বিড় করে বলল, "আর, যখন এতদিন পরে দেখা।"

তারপরে রাধার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জর্জরিত হয়ে ভাবলাম, এ কাজ না করলেই হ'ত। ওর অনিচ্ছার সূত্র ধরে যদি ওকে বোঝাতাম, কফি হাউসে গে লোথারিয়ো আর ডন জুয়ানেরা গলাগলি ক'রে বসে থাকে; বেকী শার্প আর অ্যাম্বার অহরহ চলাফেরা করে। তাহ'লে রাধা ভয় পেত,

আমিও নিমন্ত্রণের দায় এড়িয়ে যেতাম। মুখোমুখী টেবিলে বসে রাধার সন্ধানী দৃষ্টি ও প্রশ্নসায়কে আমি সম্পূর্ণ বিদ্ধ হ'লাম। দেখা হওয়া মাত্র মরমে মরে গিয়েছিলাম। এখন আমার অন্তিম-শয্যা আস্তৃত হ'ল।

প্রথমে প্রশ্ন করল রাধা, "এখন কি করছ?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিতে হ'ল, "কিছুই না।"

"জীবনের উদ্দেশ কি তোমার? কি করবে?"

সবিনয়ে আবার নেতিবাচক উত্তর দিলাম। রাধা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে আমার জীবনের সম্পূর্ণ অসারতা দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম।

কফি শেষ করে রাধা চাঙ্গা হয়ে আবার প্রশ্নজাল বিস্তার করল। প্রকৃত-পক্ষে, আমার বয়স ছাড়া ও সব কিছুই জিজ্ঞাসা করল। বয়সটা জানা ছিল বলেই কি, অথবা তাহ'লে ওর নিজের বয়স নিয়ে টানাটানি চলবে, এই চিন্তায় ও নিরস্ত হ'ল জানি না। নিজের কথা জানাল রাধা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গাম্ভীর্যে। বি-এ. পাশ করে ওর স্কুলে কাজ নিতে হয়েছিল পিতার অসুস্থতার জন্য। এবারে ছুটি নিয়ে বি-টি. পাশ করেছে ভবিষ্যতে উন্নতির আশায়। এম-এ. পাশ করে কলেজে কাজ নিলে ভাল হবে বিবেচনায় আজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল খোঁজখবরে। স্কুলের পর এসেছে শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রীটে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেশ। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগছে। একঘেয়ে কাজ আর কর্তব্যপালনে বাঁধা রাধা। ছোট বোন আছে বাড়ীতে, বাবা নামমাত্র পেনসনে রিটায়ার করেছেন। ভাইটি ছোট। দায়িত্ব অনেক রাধার। গোঁড়া বাড়ীর মেয়ে হ'লেও জীবিকার খোঁজে পথে নামতে হয়েছে। আমাকে সগর্বে খবর দিল, ব্যাঙ্কেও কিছু জমাতে পারা গেছে। তবে, রাধার লক্ষ্য বহু উর্ধে—উন্নতি তার আদর্শ, নিজের শক্তির বলে। মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এদেরই কল্পনায় লিখেছিলেন:

> "নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার—"

আদর্শ নারী রাধা। গৃহে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা, গৃহকর্ম সবি সে করে।

ছোট ভাইবোনের শিক্ষার দায়িত্বও তারি উপরে। পরিহাস করে বললাম, "রাধার কৃষ্ণটি এলেই এখন ভালো হয়।"

পরকলার ঝকমকে লক্ষ্য আমার দিকে ফেলে রাধা বলে উঠল, "ও কি কথা বলছ? আমি বিয়ে করলে সংসার চলবে কি করে? আমার ওপরে কত ভার!"

সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম রাধার কর্তব্যময়ী মূর্তির সম্মুখে। নিজের জীবন হীন মনে হ'ল। নিজে আছি নিজেকে নিয়ে, আর রাধা বাঁচছে অন্যের প্রয়োজনে। স্থির করলাম, একটা ভদ্রগোছের কাজ করবার চেষ্টা করব, বেকার সাহিত্যচর্চা ছেড়ে।

রাধা রুমালে মুখ মুছে বলল, "বরঞ্চ, ছোট বোনটার বিয়ে পাত্র ভাল পেলে দিতে পারি। দাওনা, একটা দেখে-শুনে।"

"পাত্র কোথায় পাব?"

আমার দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি হেনে রাধা বলল, "কেন? তুমি কি ছেলেদের সঙ্গে মেশো না? শুনি সাহিত্যিকেরা অবাধ মেলামেশার ভক্ত।"

রাধার কণ্ঠস্বরে 'সাহিত্যিকেরা' ক্রিমিনাল বনে গেলেন। স্বজাতির লজ্জায় বিষণ্ণ কণ্ঠে বললাম, "যাদের সঙ্গে মিশি, তাঁরা তো বোনের পাত্র হিসাবে লোভনীয় নয়। তা, তুমি কাজকর্ম করছ, তুমিও কি কথাবার্তা বন্ধ করে থাক নাকি পুরুষজাতির সঙ্গে?"

রাধার মাথা ইঞ্চিখানেক উচ্চ হ'য়ে উঠল—"আমি পারতপক্ষে কারুর সঙ্গে কথাটিও কই না। আমার নামে এ পর্যন্ত একটা কথাও কেউ বলতে পারেনি।"

ম্রিয়মাণ হয়ে উঠলাম, কারণ আমার নামে একটা ছেড়ে একশোটা কথা যে লোকে বলে বেড়ায় তা আমি জানি। কারণ না জানলেও, ঘটনাটা জানা আছে। মাথা নামিয়ে বিলটা মিটিয়ে দিলাম।

রাধা হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, "ওঃ, কত বেলা হয়ে গেল! বাড়ী গিয়ে দেখব মা রান্নাঘরে ঢুকে বসে আছেন।"

"কেন, মা রান্না করেন না? তুমি তো বাইরের কাজ কর।" তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি আমার দিকে হেনে রাধা উত্তর দিল, "মা কি দু'বেলাই

আমার জন্যে রাঁধবেন? শরীর খারাপ ওঁর। রাঁধবার লোক যতদিন না রাখতে পারি, নিজেই একবেলা রান্না করি।"

"তোমার বোন তো পারে?"

"বেশ তুমি! আমি থাকতে ও রাঁধবে কি? পড়াশুনো নেই ওর?" নিজের স্বার্থপরতায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ক্রমেই রাধার পাশে নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সম্পূর্ণ বিলীন হ'বার পূর্বেই পালাই। বললাম, "যাই এবার। তোমার অনেকটা সময় নষ্ট হ'ল। কাজের লোক তুমি।"

রাধাও উঠে দাঁড়াল, "আজ কাজ হ'বে না। মাসকাবারের টাকাটা পেয়ে জিনিষপত্রও কিছু কিনতে কিনতে দেরী হয়ে গেল এমনিই। তুমি এখন যাবে কোথায়?"

অনেক জায়গা ছিল যাবার। বল্লেই রাধার প্রশ্নবাণ বর্ষিত হবে, আশঙ্কায় রাধার হাতের পূর্ণ থলিটির দিকে চেয়ে প্রথমেই যা মনে এল স্বচ্ছন্দে বলে দিলাম, "আমারও ক'টা জিনিষ কেনবার আছে। নিউ মার্কেটে যাব ভাবছি একবার।"

রাধা বলল, "আমি বহুকাল নিউ মার্কেটে যাই না। না হয় চল তোমার সঙ্গে আজ যাওয়া যাক। বোনের জন্যে না হয় তোমার মত দুটো পাশ চিরুনি কিনে নেব। অনেক দিন ধরে চাইছে বেচারী।"

ব্যাকুলভাবে বললাম, "তোমার সময় নষ্ট হ'বে না? অত কাজ বলছিলে।"

একটু ভেবে রাধা বলল, "আজকের দিনটা এমনি গেল। ভাই-বোন দুটোকে বাড়ী ফিরে পড়া বলে দেবখন। আজ ক'টা জামা সেলাই করবার ছিল, তা থাক। মা রান্নাঘর থেকে আর বেরোতে চাইবেন না। যাই তোমার সঙ্গেই। এতদিন পরে দেখা হ'ল। তুমি তো চিরকালই কাজ পণ্ড করবার পাণ্ডা!"

কুকুরের মত রাধার পেছনে পেছনে ট্রামে উঠে বসলাম। পথে রাধা কামানের গোলা বর্ষণের মত প্রশ্নবর্ষণে আমাকে হয়রান করে তুলল। তার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের প্রভেদ এতই বেশী, আমার উদ্দেশহীন জীবনকে বুঝবার তার এতই অক্ষমতা, যে কৌতূহল তার পক্ষে স্বাভাবিক।

রাধা নিজের ভবিষ্যতের কথাও বলল—ব্লেম্‌লেস্‌ লাইফের স্বর্ণচিত্র একখানি। বিবাহের কথা যে সে একেবারে না ভাবে তা নয়। ছোট ভাই মানুষ হ'লে তবে রাধার ছুটী। রাধার ভাই প্রবেশিকার ছাত্র। তার মানুষ হ'তে হ'তে রাধার আদৌ ও ভাবনার ক্ষেত্র থাকবে না, চিন্তা করে নিরস্ত হ'লাম। রাধা আরও জানাল এম.এ প্রাইভেট পড়ে পাশ করবার পরে কলেজে কাজ নেবে ও। ভাইকে গাড়ী চালানো শিখিয়ে একখানা ছোট সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী যদি কোনমতে কিস্তিবন্দীতে কেনা যায়, তাহলেই রাধার সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বে। সর্বদা ট্রামে বাসে দৌড়োদৌড়ি করা বড় কষ্টকর, যে-সে গায়ের সঙ্গে গা লাগায়। হাতে প্রায় সর্বদাই সওদা থাকে—বোঝা টনা বড় কঠিন গাড়ী ছাড়া।

কত বছর পরে রাধার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাহনরূপ-পর্বত লঙ্ঘন করবে জানি না। আপাততঃ তো গতি তার খঞ্জ।

নিউ মার্কেটে রাধা একটু বিমনা হয়ে পড়ল, "সত্যি বলতে কি, এখানে এলেই জিনিষপত্র কিনতে ইচ্ছা করে।"

রাধার স্বীকারোক্তিতে সচকিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন তরুণী সাজ ও হাসির ঝলক তুলে মোড়ের দোকান থেকে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

বজ্রাহত ব্যক্তির মত রাধা ফিস্‌ ফিস্‌ করে জানাল, "আরে, এযে সুমিতা!"

সুমিতাই বটে। কাঁধ পর্যন্ত কাটা চুল শ্যাম্পুস্ফীত। কোমর উদ্‌ঘাটিত চোলি জামায়। নখে, ঠোঁটে, গালে লালে-লাল। ভুরু আঁকা। দেহের গঠন সরবে হাল্কা সিফনের নীচ থেকে অস্তিত্ব জাহির করছে। বি-এ. ক্লাশের সুমিতার সঙ্গে এ সুমিতার অনেক প্রভেদ।

পাশে সুবেশ তরুণ, গায়ে গা লাগিয়ে। সুমিতা আমাদের জড়িয়ে ধরল, "চিনতে পারছিস না?"

রাধা ক্ষীণস্বরে বলল, "তুমি না কি কাজ কর"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, করি তো। তাই কি?" হাতের ও কানের হীরক ঝলসে উঠল সুমিতার, "ভারী কাজ! ছেড়ে দেব ভাবছি।"

সুমিতার সম্পর্কে সব তথ্য আমরা জানতাম। ইতিপূর্বে আজ রাধাও জানিয়েছিল সুমিতা অধঃপতনের শেষ সীমায় গেছে, ওর চেয়ে সুমিতার মরণ মঙ্গল। এখন অতর্কিত ভাবে মুখোমুখী সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করলাম। বিশেষতঃ, রাধার চারিত্র কঠোরতা স্মরণ করে।

আমার পা থেকে মাথায় চোখ বুলিয়ে সুমিতা বসে উঠল: "হ্যালো, খুব তো গরম গরম লেখ। নিজে এমন নরম কেন? চুলগুলো অমন বিশ্রী-ভাবে রেখেছ কেন? কেটে ফেল না আমার মত। It would at least give you a modern look. এখন ক্রেপ্-ডি-সিন্? Horrible." রাধার বিষয়ে সজ্জার উপদেশ সুমিতা অপাত্রে ন্যস্ত করল না। দ্বিতীয়বার মরমে মরে গেলাম। পাশাপাশি আয়নায় ছায়া পড়েছে দোকানে। 'পিতার হোটেলে' যথেচ্ছা আহারের ফলে দেহস্থূল। অবিরত শুয়ে-বসে লেখাপড়ার ফলে মধ্য-বয়সসুলভ মেদ ভারে পূর্বাহ্ণেই পীড়িত আমি। পাশের তরুণীটি যেন ছিপ্-ছিপে কঞ্চি। চলন-বলনে কোথাও ভার নেই ওর। আশ্চর্য, অধঃপতন কিন্তু সুমিতাকে চমৎকার মানিয়েছে। রূপ ছিল না যার, আজ সে রাতারাতি রূপসী হয়ে উঠেছে। শুধু ধার করা নয়; চোখের দীপ্তি, হাসির উজ্জ্বলতা, দেহের সুষমা তো অকৃত্রিম।

রাধার সঙ্গে সুমিতার তুলনা চলে না। নিজের কর্তব্যপালনে রাধার সান্ত্বনা আছে। আমার সান্ত্বনা কোথায়? রাধা এক প্রত্যন্তদেশে, সুমিতা অন্য এক প্রত্যন্তদেশে। দুজনের মধ্যে ত্রিশঙ্কু আমি। হায়, হায়!

সুমিতা আমাদের হাত ধরে টানল, "এস না, কোথাও আইসক্রীম খাই। এতদিন পরে দেখা হ'ল। রজট্, শোন, এঁরা আমার কলেজবন্ধু।"

রজত নামধারী ভদ্রলোক নমস্কার করলেন এগিয়ে। সুদর্শন যুবক, সুমিতার প্রতি তদ্গত, সহজেই বোঝা যায়।

আমাদের কিছুতে আইসক্রীমে রাজী করাতে না পেরে সুমিতা শেষে বলল, "কোথায় যাবে? চল, ড্রপ করে দি।"

"গাড়ী কিনেছ নাকি?" রাধা আর্তনাদের মত স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, তা আমি না কিনলেও বলতে গেলে আমারি। এস না।"

কুলী ঝুড়িভর্তি জিনিষপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি অক্ষমতা জানালাম, "আমাদের কাজ আছে।"

"ও, তোমরা যে কাজের লোক, ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি অকেজো মানুষ, কাজের ধার ধারিনে। এসো রজট্।" রজতের হাত ধরে টেনে ক্ষিপ্র-গমনে সুমিতা রওনা হ'ল, পেছনে বোঝা নিয়ে কুলী।

রুদ্ধস্বরে রাধা বলল, "সুমিতা গরীবের মেয়ে ছিল। এত টাকা হ'ল কেমন করে ওর?"

"কেমন করে মেয়েদের টাকা হ'তে পারে, তা তো তুমি জান, রাধা। নির্লজ্জের একশেষ! তোমাকে যা নিজে অর্জন করে নিতে হচ্ছে ও তা উপহার পাচ্ছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অপ্রত্যাশিতভাবে রাধা বলে উঠল, "কে বলবে আমা-দের বয়সী? দেখে দশবছরের ছোট মনে হয়, না?"

নিঃশব্দে দু'জনে বেরিয়ে এলাম বাজার থেকে।

"তাহ'লে যাই, রাধা। বাস আসছে। তোমার রুট তো উলটো দিকে।"

রাধা পরিপূর্ণ ঝোলা সামলে সম্মতি দিল। বিদায় জ্ঞাপন করে উঠে বসলাম বাসে। ওপাশ দিয়ে সুমিতার ঝকঝকে গাড়ী ছুটে চলে গেল পালকের মত।

রাধা মাথা উঁচু করে রাস্তায় ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে যাবে সে-ও ভাল, বাসের সার্বজনীন ঠেলাঠেলি ওর অসহ্য। কত বোঝা ওর হাতে! কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'বে কে জানে? সুমিতার নিমন্ত্রণ নিলে ভাল করত রাধা।

বাস ছেড়ে দিল। চলে যেতে যেতে রাধার কথাই আবার ভাবলাম। সৎচরিত্রের বোঝা শেষ পর্যন্ত টেনে রাধা চলতে পারবে তো?

হ্যাঁ, বৃদ্ধের মেয়েরাই ওকে হত্যা করেছে। এই চমৎকার সুন্দরী তরুণী দু'টি কি হত্যাকারী ? শুনতে বিস্ময় বোধ হ'লেও কথাটা সত্য। আমি যে ভাল করে জানি।

দু'টি মেয়ে ছিল বৃদ্ধের। আহা, যেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল। প্রথমা বিবাহিতা, দ্বিতীয়া কুমারী। প্রথমার রং ফ্যাকাশে; রক্তহীন নির্জীব নারীর গৌরবর্ণ যেমন করে ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যায়, গোলাপ যেমন করে পাণ্ডু হয়ে যায়, দশ বছরের নিরানন্দ বিবাহিত জীবনে প্রথমা তেমনি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়া হয়েছে প্রথমার প্রথম সংস্করণ। প্রথমার ফ্যাকাশে রং দ্বিতীয়ার গাত্রে রক্ত-গোলাপ হয়ে ফুটেছে। প্রথমার বড় বড় করুণ চোখে প্রাণদ্যুতির অভাব দ্বিতীয়ার চোখে নেই। প্রথমার ক্ষীণ ভদ্রতাসূচক হাস্য দ্বিতীয়ার অধরে হয়েছে ঝিকি-মিকি মুক্তার মালার ঝলক। প্রথমা যা ছিল আগে, দ্বিতীয়া এখন তাই। প্রথমার প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয়া। দ্বিতীয়ার প্রথম সংস্করণ এখনও চলেছে। দ্বিতীয় সংস্করণের দেরী আছে।

প্রথমা কলিকাতার উপকণ্ঠে থাকে স্বামী ও পুত্রকন্যা সহ। দ্বিতীয়া ছাত্রীবাস থেকে এম. এ. পাশ করেছে। মা গত হয়েছেন। আর ভাইবোন নেই। ধনী পিতা পশ্চিমের বাড়ীতে একা থাকেন দাসী-চাকর নিয়ে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল দ্বিতীয়া ছাত্রীবাস ছেড়ে দিদির বাড়ী থাকতে এলো। নানা রাজনৈতিক কারণে বৃদ্ধ পিতার একা একা পশ্চিমে থাকা চলছে

না। তিনি আসছেন কলিকাতায়। শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে থাকবেন, ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন।

বড় মেয়েকে যথারীতি পত্র লেখা হয়েছিল বাড়ীভাড়া করে রাখতে। সে কলিকাতায় বাড়ীর টানাটানিতে ভাল বাড়া পেল না। তার নিজের বড় বাড়ী আছে। পিতার পক্ষে সেখানে নামাই সমীচান। দ্বিতীয়ার পড়াশোনা হয়ে গেছে। ও বরঞ্চ বোনের কাছে চলে আসুক। জামাতার গৃহে থাকতে বৃদ্ধের লজ্জা হওয়া উচিত নয়। তিনি নিজে জামাতাকে দশবার কিনে নিতে পারেন।

সুতরাং মেয়ের সংসারে টাকা দিয়ে সম্মানিত অতিথিরূপে এলেন বৃদ্ধ থাকতে। দ্বিতীয়াও চলে এল। আমার গল্পের আরম্ভ এখান থেকে।

তারপর? ধনী পিতার ভবিষ্যৎ-উত্তরাধিকারিণীরা তাঁকে অত্যন্ত যত্ন করেছিল। কেউ তাদের অমনোযোগের দোষ দিতে পারবে না। অতি যত্ন। হ্যাঁ, অতি যত্ন।

বৃদ্ধ থাকতেন প্রকাণ্ড একটি রাজকীয় ঘরে। পাশের ছোট ঘরটায় রইত দ্বিতীয় কন্যা। মেজেতে শয়ন করে থাকত পুরণো ঝি চিন্তামণি।

বৃদ্ধের অভ্যাস ছিল প্রাতঃভ্রমণের। সকালবেলা উঠে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে চলে যেতেন হাঁটতে হাঁটতে। ফিরে এসে দুধ খেতেন। সত্তরের উপর-বয়স হ'লেও চলাফেরা সবই তরুণ-সুলভ ছিল। স্বচ্ছল আবহাওয়ায় পশ্চিমা পেটা শরীর। আশা করা যায় বৃদ্ধ অনেকদিন ধরে শিবরাত্রির সলতের মত কন্যাদের আনন্দ দিতে গৃহে জ্বলবেন। প্রথমার ও দ্বিতীয়ার আনন্দ দেখে কে?

সকালে উঠে প্রথমা বাবার খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করে, দ্বিতীয়া খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। চিন্তামণি স্নানের ঘরে জল ঠিক রাখে, নব চাকর তেল মাখায়। দ্বিতীয়া কাপড় ছাড়িয়ে দেয়, প্রথমা খাবার-টেবল সাজায়। কোন কোন দিন বা শুক্ত, ঘণ্টটা রান্না করে দেয়। খেয়ে উঠতে না উঠতে দ্বিতীয়া খড়কে-মশলা নিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমা দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার শয্যা গোছায়। নিজেরা খাওয়া সেরে বাবার শিয়রে বসে কেউ বা পাকা চুল তোলে, কেউ বা হাত-পা টিপে দেয়। নানা গল্প, রাজনৈতিক আলোচনা করে। বিকেল হ'তে না হ'তে চা-খাবার হাজির। বাড়ীর গাড়ীখানা জামাই অফিস থেকে পাঠায়, বৃদ্ধ ময়দানে হাওয়া খেতে যান। প্রথমা কন্যার বিবাহের পরে পত্নী গত

হয়েছিলেন, দ্বিতীয়ার ছাত্রীবস্থা চলছিল। মেয়েদের সেবা এই প্রথম। আনন্দে বৃদ্ধের চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গে যাবার দশা।

লম্পট বড় জামাই আড়চোখে তাকিয়ে দেখে বৃদ্ধের পুষ্ট শরীরে নব চাকর কেমন তেল মাখাচ্ছে। চিন্তামণি পেস্তার সরবৎ হাতে দিচ্ছে। অবশ্য ঝি-চাকর ত্র'জনের বেতন বৃদ্ধই দিচ্ছেন। জামাতার অচল সংসার চালের ওপর ধারে চলছিল। বৃদ্ধ এসে রাতারাতি সচল হয়েছে—গড়িয়ে চলেছে চাকার মত। সাধে কি মেয়ে-জামাই বাড়ীতে গণেশ প্রতিষ্ঠা করেছে বৃদ্ধকে এনে ফেলে।

অগাধ টাকা। কে বেশী পাবে? সেবা-যত্ন নিয়ে তুই মেয়ের মধ্যে রেশারেশি চলে। আবার অন্য কেউ ভাগ না বসায়? শ্যেন দৃষ্টিতে তুই বোন লক্ষ্য করে যায়। কি নিরলস সেবা, কি একাগ্র লক্ষ্য। ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

কিছুদিন যেতে না যেতে বৃদ্ধের স্বাস্থ্য আরও ভাল হয়ে গেল। বাত ধরেছিল, পশ্চিমী হাওয়া সহ্য হচ্ছিল না। কলকাতার নমনীয় জল বাতাস, মেয়েদের যত্ন বৃদ্ধকে তাজা করে তুলল। তিনি ফুলেল তেল, চন্দনের সাবান, ভেসলীন, হেয়ার টনিক ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। নব চাকরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল কালাপেড়ে ধুতি গিলে করে রাখতে। দর্জি রেশমী জামার অর্ডার ফিতে মেপে নিয়ে গেল। বেলফুলের মালা যোগাবার মালী ঠিক হ'ল। তরুণ যৌবনের হীরের আংটি ও বোতাম বার হ'ল। নটবর বেশে বুড়ো কর্তামশাই নব-যৌবনের জন্য আরাধনা করতে লাগলেন। ছোট মেয়ের বিবাহের পাত্রের সন্ধান করতেও ভুলে গেলেন একেবারে।

মেয়েরা লজ্জায় মরে গেল। বেচারীরা! প্রথমার স্বামীর বারটান আছে, মন ভার করে থাকে সে। তার ওপর বাবার এ-হেন বেশ-বিপর্যয়ে বওয়াটে স্বামীর খোঁটা তাকে বিচলিত করে তুলল। ছোটটী ভরা-যৌবনে অবিবাহিতা। বাবার কোন চেষ্টা নেই, বিরহিণী নলিনীর মত সে মলিন হয়ে রইল। আশেপাশে সব ধর্মভীরু প্রতিবেশী। পঁচাত্তরের বৃদ্ধের বিকার দেখে গা-টেপাটেপি করে। একদিন শোনা গেল বাঁধান দাঁত ঠকঠক করে বৃদ্ধ গান ধরেছেন—

"তোমার আমার গোপন কথা জানলো যে লোকে,
সখি, জানলো যে লোকে—"

দুই মেয়ে বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ল। তাদের ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করছে পিতার ওপর। শ্যেন দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখল তারা। অনেক কিছুই ধরা পড়ল।

চিন্তামণি, চিন্তামণি, চিন্তামণি। বেয়াল্লিশের ধাড়ী মন হরণ করেছে গঙ্গাযাত্রীর। আরে ছি, ছি! মাতা ছিলেন পটের পরী, বনেদী বাড়ীর দুহিতা। তারপরে এই মেচেতাপড়া, কাল ধুমসী, তাতে একটা ঝি! ছি, ছি! কন্যারা সন্দেহ করতে লাগল পিতা বোধহয় পশ্চিমেও এমনি ছিলেন।

চিন্তামণি ফিতেপাড় শান্তিপুরী পরছে। দিল কে? কাণে হঠাৎ সোনার কানফুল কেন, হাতে শাখা বাঁধা? মেয়েদের থেকে বেশী যত্ন করছে ও বৃদ্ধের। খাওয়া-পরা সব কিছু বুক দিয়ে আগলে আছে। ডাইনীর মত পাহারা দিচ্ছে বুড়োকে। নিত্য বৃদ্ধের যৌবনোদ্গম হচ্ছে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। চিন্তামনির চরিত্র দেখে প্রথমা-দ্বিতীয়া চিন্তায় পড়ল।

চিন্তামণি বৃদ্ধের সেবার যাবতীয় ভার নিয়েছিল। মেয়েরা একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। অনভ্যস্ত তারা সেবায়, অথচ পিতার মনোরঞ্জনে উঠিপড়ি করে লেগেছিল। যে যার সামাজিক জগতে আবার ধীরে ধীরে যাচ্ছিল ফিরে। হঠাৎ এই অঘটনের সম্ভাবনা। নিশ্বাস ফেলে দুই মেয়ে আবার লেগে গেল। চিন্তামণিকে যতদূর সম্ভব পেছু হটিয়ে পিতার সেবাযত্নে তৎপর হ'ল। কিন্তু এবারে বৃদ্ধ যেন সেটি পছন্দ করলেন না। বিরক্তির লক্ষণ দেখা গেল। মেয়েরা পরামর্শের বৈঠক বসাল। বাবা তো নিজের কর্তা নিজে। চিন্তামণিকে নিয়ে আলাদা বাসা বাঁধতে ওঁর বাধা কি? কি করা যায়?

একদিন দুই মেয়ে শুনল সন্ধ্যাবেলায় সিঁড়ির ধারে চিন্তামণির আঁচল চেপে ধরে বৃদ্ধ গান ধরেছেন—

"চিন্তামণি লো, তোর চিন্তা কিসের এত?"

বোঝা গেল কথা স্বীয়, সুর নিধুবাবুর। এবারে আর বিলম্ব করা চলে না। ছলে-বলে-কৌশলে চিন্তামণিকে সরান দরকার।

ছোট মেয়ে বুড়োকে ভুলিয়েভালিয়ে দুই দিনের জন্য কলিকাতার বাইরে নিয়ে গেল মাসীর বাড়ী, তার মধ্যে চিন্তামণি বিতাড়িত হ'ল। বৃদ্ধ ফিরে এসে হা-পিত্যেশ করবার আগেই তাঁকে জানান হ'ল চিন্তামণি এক লোকার

প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী। বৃদ্ধ ঘেন্নায় চিন্তামণিকে ভুলবার চেষ্টা করলেন। গরমে ট্রেনে যাতায়াতে শরীর খারাপ হয়েছিল। মনের খেদ যোগ হ'ল, বৃদ্ধ শয্যা নিলেন।

না, না, এভাবে তো মেয়েরা তাঁকে হত্যা করেনি। তাহ'লে তো দৈবের স্কন্ধে দোষারোপ করা যেত। 'দৈবের' কি রূপ জানি না, তবে অবশ্যই স্কন্ধটি চওড়া। যে যা দোষ করে তখনি অনায়াসে ওই স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়।

ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত ঝরঝরে অবস্থায় বৃদ্ধ সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু হৃত স্বাস্থ্য ফিরে এল না। সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর এবারে মেয়েদের নিতে হ'ল। আর তো চিন্তামণি নেই। হা চিন্তামণি, যো চিন্তামণি!

চিন্তামণি যে কতটা কাজ করত, সে চলে গেলেই বোঝা গেল বেশ। সে সেবা-যত্ন সবটাই শেষে একা করত, দুই মেয়ে কেবল তদারক করে ক্ষান্ত ছিল। প্রথমে সেবার যে ঝোঁক ছিল, শেষে তা রইল না। পিতার প্রকৃতিতে প্রবৃত্তিও গেল। সর্বোপরি নিজের নিজের জগতে ফিরে গিয়ে আটকে পড়েছিল তারা। বিব্রত হয়ে উঠল দু'জনে।

দ্বিতীয়া নখে রং ঘষতে ঘষতে বলল, "দিদি শোন, আর একটা লোক রাখা যাক চিন্তামণির বদলী। বাবার কষ্ট হচ্ছে, আমরা তো ঠিকঠাক পারছি না। নবও পারছে না একা একা।"

নিশ্বাস ফেলে প্রথমা বলল, "তাই—দেখি। ছেলেমেয়ে দু'টোকে দেখাশোনা করতে পারিনে। লোক রাখতেই হ'বে। তবে এবারে চাকর, ঝি নয়।"

এল নানা জাতির, নানা রূপের ভৃত্য-গড্ডালিকা। মনোমত কেউ নয়, কেউ বা বৃদ্ধের দুধ চুরি করে খায়, কেউ বা পয়সা হাতায়। বৃদ্ধ খিটখিটে হয়ে উঠলেন। সেবা-যত্নও হচ্ছিল না এদের দ্বারা। অতি যত্নে অভ্যস্ত উনি, এখন দিন চলে কি করে? দেহে এখনও তেজ আছে, পছন্দ-অপছন্দের বালাই তাই!

"নাঃ, ঝি-এর কাজ কি চাকর দিয়ে চলে? সেবা-যত্ন মেয়ে-মানুষে যা পারে, তা কেউ পারে না। চমৎকার দিন কাটছিল। দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিলুম। হঠাৎ বাবার বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরল।"

দ্বিতীয়ার কথার উত্তরে প্রথমা আস্তে আস্তে বলল, "এতদিনের ঝি-টা আমার ছিল, বাড়ীর লোকের মত হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে দেখেও সংসার দেখতে পারত। এখন সবই আমার ওপরে পড়েছে।"

দ্বিতীয়া সখেদে ঝঙ্কার দিল, "বুড়ো মানুষ বুড়োর মত থাকুন না কেন? নিজেকে তরুণ মনে করলেই কি আর চলে।"

দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সহসা কথা বন্ধ করে। বিদ্যুতের মত একই চিন্তা দু'জনের মনেই খেলে গেল। কথায় অবশ্য কেউ কাকেও কিছু বলল না। কিন্তু, পরস্পরের মন ছুঁয়ে হাজার বার কথা চালাল তারা মনে মনে। বৃদ্ধের সমাধি নির্মাণ হয়ে গেল সেই দিনে।

তারপর থেকে চলল এক অভিযান। নিষ্ঠুরতায় তাইমুরের বিজয়ের মত। ভারতবর্ষীয় গ্রীষ্ম এসেছিল বৃদ্ধের শীতের প্রাঙ্গণে—'ফরসাইথ সাগার' বৃদ্ধের মতই। শীত দিয়ে গ্রীষ্মকে বিলোপ করে, জরা দিয়ে যৌবনকে ক্ষয় করার সাধনা নিল মেয়েরা। সত্যই তো, আশেপাশের বাড়ীর লোকেরা হাসাহাসি করে বৃদ্ধের তারুণ্যের সাধনা দেখে। পিতা হবেন বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও সৌম্য। ঘরে বসে পড়বেন ভাগবত, ধীরে কথা বলবেন। পরকালের চিন্তা করে যাবেন এক মনে। শীঘ্রই ডঙ্কা বাজিয়ে পরকালের পথে পা বাড়াবেন। ফুলের মালায় ছবি সাজিয়ে ধূপের ধোঁয়ায় বন্দনা করবে মেয়েরা। আর এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে চেকে সই করবে। এই তো নিয়ম!

আচ্ছা। একদিন স্নানের ঘরে দেখা গেল কালাপেড়ে গিলে-কোঁচানো ধুতির পরিবর্তে থানধুতি একখানা রয়েছে। বৃদ্ধ আপত্তি জানাতেই প্রথমা সবিনয়ে বলে দিল, "কালাপেড়ে ধুতি বাজারে নেই। আপনার জামাই থান কিনে এনেছে তাই।"

দ্বিতীয়া যোগ দিল, "এত বয়েসে বাবাকে তো শাদা থানেই মানায়। যেন ঠিক ভোলানাথ। পেড়ে ধুতি পরার দরকার কি এখন? জামাইবাবুর ধুতির সঙ্গে মিশে যায় হরদম।"

বৃদ্ধ বিরক্ত হ'লেও চক্ষুলজ্জায় থান মেনে নিলেন।

আর একদিন নাতি এল লাফাতে লাফাতে, "দাদু, তুমি সিল্কের জামা পর কেন বুড়ো বয়সে? লোকে যে তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে হাসে।"

ছোট মেয়ে লজ্জার ভান দেখিয়ে বলে উঠল, "যা, যা, চুপ কর, খোকা ; ওগুলো আগে করা হয়েছিল। এবারে সাদা জামা করতে দিয়েছেন দাদু।" সুতরাং সাদা জামা করতে দিতেই হ'ল দর্জি এলে।

প্রথমা একদিন সকালে দৌড়ে এল, "বাবা আজ বড় গরম পড়েছে। রোদে হাঁটাহাঁটি করতে বার হবেন না। শরীরটা তো তেমন ভাল যাচ্ছে না আপনার আজকাল। তার চেয়ে চুপচাপ বসে বই-টই পড়ুন ; এ বয়সে সকালে অতটা ঘোরা ঠিক নয়।"

বৃদ্ধ সতেজে প্রতিবাদ করতে গেলেন, অমনি পাশ থেকে দ্বিতীয়া ফোড়ন দিল, "না না, বাবা। মাসীর বাড়ী থেকে ফেরার পরেই আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। আধখানা হয়ে গেছেন, হ্যাঁ ! এত বয়স হ'ল আপনার, এমন চেহারা কোনদিন দেখিনি। এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন না।"

হাজার হলেও মেয়েরা এত করছে, তাতে তারা যেন অভিভাবক। কত আর কথা এড়ানো যায় ? বৃদ্ধ প্রাতঃভ্রমণ ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দিলেন। সর্বদা কানের গোড়ায় দুই মেয়ে শোনাতে লাগল তাঁর বয়স অনেক, স্বাস্থ্য খারাপ, দিন আসন্ন। এখন আর ইহকালের দিকে নজর রাখা ভাল দেখায় না, পর-কালের দিকে তাকান উচিত। ধর্মকে ভুললে চলে না।

বৃদ্ধ কেমন যেন হয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। ব্যায়াম ছিল হাঁটা। মেয়েদের সহৃদয়তায় গেল সেটি। স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, বাতে ধরল আবার। মনের আনন্দ, মুখের হাসি সবই গেল। সর্বদা বিষণ্ন হয়ে থাকেন। মেয়েরা খবরের কাগজের বদলে ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনায়। অতি মমতায়, অতি যত্নে স্বাভাবিক মানুষের জন্মগত অধিকার চলাফেরা, সহজ জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করে রাখে। বৃদ্ধ অবশেষে সম্পূর্ণ শয্যাগত হয়ে পড়লেন। রুক্ষ মেজাজী বুড়ী আংলো ইণ্ডিয়ান নার্সের ভরসায় দিয়ে মেয়েরা এতদিনে একটু ছুটী পেল।

আর বাবা অবুঝ হ'ন না। আর বাবা চঞ্চল-অশান্ত জীব নন। কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে দেখবার দিনও চলে গেছে ওঁর। অর্ধেক দিন বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, খাবারের রুচি নেই। মেয়েরা খেতে পীড়াপীড়ি করে না। ডাক্তার নিষেধ করেছেন। যা রুচি খান, শেষে পেটের অসুখ ধরে

যদি ? ওঠা-নামা না করে ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকাই ভাল। কারণ, না হ'লে চোখ রাখা দায়। ছুটোছুটী না করে এ বয়সে বিশ্রাম নেওয়াই শ্রেয়। কতদিন আর আছেন ?

সারাজীবনের তৎপর দেহ আস্তে আস্তে একটু একটু করে জড় পদার্থে পরিণত হ'ল। বৃদ্ধ প্রথমে যথেষ্ট প্রতিরোধ করেছিলেন। দুই মেয়ের ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মানতে হ'ল। জীবনীশক্তি অদম্য উৎসাহে বারে বারে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। যে শক্তি বৃদ্ধের মধ্যে ছিল, তাঁরই রক্তে জাত কন্যাদের মধ্যে সে শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান; বিশেষতঃ তারা তরুণ এখনও। তারা দু'জন। এক অক্ষম বৃদ্ধের অসহায়তার বিপক্ষে দুই জন। প্রাণশক্তি খর্ব করে মানুষকে জড়পদার্থে পরিণত করার সে কি প্রচেষ্টা !

ক্যাথেরিন ম্যান্স্‌ফিল্ডের কাহিনী স্মরণ হয়। একটি মাছির ওপরে একজন লোক অলস খেলাচ্ছলে বার বার এক ফোঁটা কালি ফেলেছিল। বারবার সেই মাছি কালি ঝেড়ে ফেলে উড়তে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু, হায়, আবার সেই অনিবার্য কালির ফোঁটা। অবশেষে মাছি ওড়ার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে মরবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তার প্রতিরোধ ভেঙে গেল।

ক্যাথেরিন ম্যান্স্‌ফিল্ডের গল্প বৃদ্ধের জীবনে দেখলাম। অবশেষে তিনি প্রাণত্যাগ করে ফেললেন।

প্রথমা দ্বিতীয়া কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলল। বাবার শ্রাদ্ধ হ'ল ঘটা করে। ফুলের মালা ছবিতে দুলল। ধূপধূনোয় মৃতের বন্দনা করা হ'ল। আবার মেয়েদের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

গল্পের শেষ এখানে নয়। হত্যাকারীর স্বার্থ-জড়িত থাকলে তবেই সে হত্যা করে। টাকা তাড়াতাড়ি পাবার লোভ নয়—ও টাকা ওরাই পেত, জীবিত-অবস্থায়ও পাবার অন্ত ছিল না। চাইলেই টাকা দিতেন বাবা। সেবা-যত্নে বিব্রত বোধ ক'রত তারা, কারণ দুজনেরই অন্য টান ছিল। তাহ'লেও অসহ্য হয়ে উঠত না, যদি না উভয়ে মনপ্রাণ দিয়ে কিছু চাইত।

আশ্চর্য ! প্রথমা চেয়েছিল মুক্তি, দ্বিতীয়া বন্ধন। প্রথমার লম্পট স্বামী বৃদ্ধের মৃত্যুর পথ চেয়েছিল। বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে জ্বলে উঠত।

অবনতি দেখে আনন্দিত হয়েছিল। উঠতে বসতে সে স্ত্রীকে জানাত—তার মনোগত ইচ্ছা।

প্রথমা সুন্দরী, শালীনতাশালিনী। মনে হ'ত, স্বামীকে সে ঘৃণা করছে। কিন্তু সেও তো এক জিনিষই চেয়েছিল—বৃদ্ধের মৃত্যু। কেন? টাকা প্রথমার কাছে ঈপ্সিত ছিল মুক্তির উপায় রূপে। হাতে পিতার সম্পত্তি পাওয়া মাত্র সে পৃথক হ'ল ছেলে-মেয়ে নিয়ে। সে মুক্তি পেল। পিতা সেকেলে ছিলেন অত্যন্ত। স্বামী-ত্যাগ তিনি সমর্থন করতেন না নিশ্চয়।

দ্বিতীয়া চেয়েছিল বন্ধন মনের মানুষের সঙ্গে। পিতা বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ওই সেকেলে হওয়ার দরুণ এক্ষেত্রেও তাঁকে জানানো সম্ভব হ'ল না। কারণ, মনের মানুষটি ছিল বিবাহিত। দ্বিতীয়াকে সে আবার বিয়ে করবে স্থির হয়েছিল। টাকায় পথটা সুগম হয় তো।

এত কথা জানলাম কি করে? তারা তো পরস্পরকে পর্যন্ত বলেনি। একই লক্ষ্যে নিঃশব্দে পাশাপাশি কাজ করে গেছে। আমি জানি। মনের কথা চোখে ঝলসে উঠতে দেখেছি তাদের।

দ্বিতীয়ার চোখে চোখ রেখে দেখেছি আমি হিংসার দ্যুতি, দেখেছি সন্ধ্যার উল্লাসে প্রবাল-অধরে মুক্তামালার ঝলক। প্রথমা আমাকে খাতির করে চা এগিয়ে দিয়েছে বোনের মুখ চেয়ে। প্রথমার শালীনতার অন্তরালে দেখেছি কুঠার হাতে জল্লাদ অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধের বাঁচা চলবে না। বিষ না দিয়ে, লোকের সন্দেহ না জাগিয়ে, যত্নের আবরণে তিলে তিলে মানুষকে হত্যা করা যায়, মানসিক প্রতিরোধ তার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। ওই সুন্দরী দুইজন তাই করেছে। ওরা হত্যাকারী।

আমি এত জানি? হ্যাঁ। আমিই সেই বিবাহিত ব্যক্তি, দ্বিতীয়ার প্রণয়ী। বাল্যবিবাহের নির্জীব স্ত্রীকে পছন্দ হয়নি। বিদুষী সুন্দরীর কাছে ছুটে এসেছিলাম।

প্রথমা যা চেয়েছিল, পেল—মুক্তি। দ্বিতীয়া কিন্তু বন্ধন পেল না—আমার থেকে অন্ততঃ নয়। ফিরে গেলাম আবার ঘরেই প্রাণহীনা পাথরের কাছে। প্রাণময়ী প্রতিমাকে আমার প্রয়োজন নেই। সুন্দরবনের নরখাদিকা ব্যাঘ্রিনীকে খাঁচার আড়াল থেকে দেখে ভাল লাগা চলে। তাকে নিয়ে কি ঘর-করা সম্ভব নাকি? সর্বনাশ!

আমার নায়িকা বড় বিপদে পড়েছে। আগে তার একটু বর্ণনা দিয়ে রাখি। যে কোন উপন্যাসের নায়িকা ও হতে পারে। এমন রূপ ওর। টুকটুকে গায়ের রং। চোখ ছুটি কুচ্‌কুচে কালো। 'আঙুর দোলানো' অলক্। হাসলে মাণিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তো। কিন্তু নায়িকার নামটি শুনলেই আপনাদের শক্ লাগবে। নাম হচ্ছে খুকী। বয়সটি আরো মারাত্মক, সবে তুই।

রসিকতা থাক। খুকী বড় বিপদে পড়েছে। খিদিরপুরে ব্যারাকের একখানা ঘর, এক ফালি বারান্দা, থাকত সে মা বাবার সঙ্গে, হঠাৎ এসে পড়ল বালীগঞ্জে মায়ের মামার মস্ত বাড়ীতে। বাগান-লাগাও তেতালা বাড়ী। গাড়ী গ্যারাজে, ঘরে বিজলী বাতি, ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোন বাজে। খুকী অবাক হয়ে ভাবে, "এতা কোন পাকী?"

মায়ের মামার বাড়ীতে, সব গোলমাল হয়ে যায় বাচ্চাটার। সবে তু'বছর পুরেছে। ছয় মাসের অভ্যস্ত ঘরকন্না ছেড়ে তারা উঠে এসে ঘাড়ে পড়েছে বড়লোক আত্মীয়ের। বাধ্য হয়ে উঠে এসেছে। খুকীর বাবার চাকুরি নেই। কারণ, স্বভাবের দোষ, মাতাল অবস্থায় অফিসে যাতায়াত করলে কতদিন আর ওপরওয়ালা সহ্য করে? হোক না কেন মামাশ্বশুর খাতিরের লোক? অনিবার্য-ভাবে কাজটি গেল খুকীর বাবার। মদ খাওয়া কিন্তু গেল না। স্ত্রীর গায়ের সামান্য গয়না, যা অবশিষ্ট ছিল, তাই বাঁধা রেখে বা বিক্রী করে নেশা চলল পুরোদমে মাস কয়েক। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ল, ভদ্রলোকের পাড়ায় হল্লার ছুতো ধরে

বাড়ীওলা উঠিয়ে দিল। একখানা ভাড়া গাড়ীর মাথায় সংক্ষিপ্ত সংসারটি গুটিয়ে তাদের উঠে আসতে হ'ল বালীগঞ্জের আশ্রয়ে।

বলা বাহুল্য মাতাল জামাই, নিরাভরণা ভাগ্নী আর অপোগণ্ড শিশুটি দেখে মামা-মামী প্রীত হ'লেন না। একে গরীব, তায় নেশাখোর। তবু হাজার হ'লেও ভাগ্নী তো! লোকে কি বলবে? 'আহা, বাছা!' করে মামী ঘরে তুলে নিলেন। দোতালার বাথরুমের পাশের ছোট ঘরখানাতে চাকর বেয়ারা মালপত্র তুলে দিতে দিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

খুকীকে মামী লোক দেখিয়ে কোলে তুলে নিতেই খুকী, 'মা', বলে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে মুখের সঙ্গে মুখ লাগাল। নিজের ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। খুকীর 'মা' ডাক শুনে মামীর প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

"আহা, দুবছরের বাচ্চা কিন্তু বাড় নেই দেখ? হবে কি করে? ঠিকমত খাবার পায় না তো। যে দানবের ঘরে জন্মেছে বাছা!" মামী খেদ প্রকাশ করে দুধের রোজ বেঁধে দিলেন। জামাকাপড় কিছুই ছিল না খুকীর, দু-একটা ফ্রক, ইজের ছাড়া। মামী দু'চারটে জামা কিনে আনলেন। সকালে বিকেলে চাকরের কোলে বেড়াবার বন্দোবস্ত হ'ল। খুকীর, বলতে গেলে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল।

তবু, দিন কত খুকী বিপদে পড়ল। আবছাভাবে ও জেনেছিল একটি ঘরে খাওয়া-শোওয়া সমস্ত। ঘুম পেলে কোণের ময়লা বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়। তেষ্টা পেলে কলসীতে জল আছে। বাক্সের পাশে একটি হাঁড়িতে মুড়ি খইও পাওয়া যেত খিদের সময়ে। কিন্তু, ক্রমেই কমে যেতে যেতে একদিন শূন্য হাঁড়ির তলা বাজল হাতে। ক্ষুধার্ত খুকী আর সেখানে খাবার পেল না। সামনে ছোট বারান্দা ছিল। মা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ওকে তোলা জল দু'ঘটি ঢেলে চান করায়। হাত ধরে ঘরে এনে ছেড়ে দেয়। খুকী ধপ করে বসে পড়ে। গুন্ গুন্ শব্দ করে কাঁদে আর দোলে। দেখতে দেখতে ভাতের থালা এসে যায়। মা ভাত-ডাল মেখে রেখে উঠে যায়। খুকী নিজের হাতে থাবা থাবা খায়। ভাত ফেল্লে মা বকে। আগে মাছ থাকত, ডিম থাকত। শেষে শুধু ডাল-ভাত। একদিন আলু সেদ্ধ শুধু। খুকীর ভাল লাগে না খেতে, ছুতো ধরে কাঁদে, আপত্তি জানায়। ফলে চড়-চাপড়টা লাভ হয় মায়ের হাতে।

হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপ জলে উঠল খুকীর ছোট জীবনে। একখানা ঘরে শোয় সে, কেমন উঁচু কাঠের তাকে! 'বিনছা' খুকোর ময়লা নয়—নরম পরিষ্কার। খেতে হয় অন্য ঘরে। খাবার কত রকম! স্নান করে বাথরুমে। কি বড় নদী, বাবা! ঝপ্ করে তাকে বসিয়ে দেয় গামলা-নদীতে। ভয় পায় খুকী গোড়ায়, শেষে হাততালি দিয়ে হাসে। তুলতে গেলে কাঁদে। তারপরেই গোল বেধে যায়। তখনি ভাতের থালা সেখানে মেলে না, যেতে হয় অন্য ঘরে। চুল আঁচড়ে মুখে পাউডার মাখানো হয়। সেখান থেকে সেই অ্যাতো বড় রাস্তা পেরিয়ে তবে খাবার ঘরে। খিদিরপুরের মত মাটীতে নয়। চেয়ার পাতা থাকে। টেবলে ছোট থালাটা রাঁধুনী রেখে যায়। খুকীর অবাক লাগে।

মা-ও যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। কত আস্তে কথা বলে! খুকীকে মারে না, বকে খুব কম। কেমন যেন সুন্দর দেখায় মাকে! চুপ করে বসে দুটো কাঠি আর রঙ্গিন দড়ি নিয়ে কি খেলা করে মা? মাঝে মাঝে খুকীকে ডেকে সেই দড়ির জাল বুকে-পিঠে ফেলে বিড়-বিড় করে 'ইঞ্চি, ঘর' কি সব বলে?

তেষ্টা পেলে মুস্কিল। ভরণের কলঙ্ক-ধরা কলসীটার সন্ধান পাওয়া যায় না কাছে পিঠে। খিদে এখানে খিদিরপুরের মত অত বেশী পায় না খুকীর। পেটে চন্‌মনে খিদে নিয়ে 'কাব, কাব' করে মাকে বিরক্ত করতে হয় না ওর। তবু হাঁড়িটা গেল কোথায়? মেজেতে এখানে জল ফেল্লে সবাই বকে। বাথরুমে যাওয়াটাও অভ্যাস নেই। ঘরদোর খুঁজে পায না খুকী। কখন পথ হারিয়ে ফেলে। বাগান থেকে বাড়ী আসতে গেলে কোথায় চলে যায়। 'মা গো, মা!' বলে কেঁদে ফেলে।

ধীরে ধীরে রপ্ত হয়ে গেল। 'কাকের বাসায় কোকিলের ছায়ের মত' আমাদের খুকী ভুলে গেল আগের বাসাড়ে-বাড়ীর কথা। নোংরা জিনিষ, খারাপ খাবার পৃথিবীতে যে আছে, সে কথা খুকীর মনে রাখা দরকার হ'ল না! মোটা-সোটা গোলগাল হয়ে উঠল সে। দাদামহাশয়ের বাড়ীতে নাতনী আদরে রয়ে গেল। মিষ্টি স্বভাব, দুঃখে অভাবে কাঁদত না। দেখতে ভাল। বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়ে নেই। খুকী আদরে লোফালুফি হ'তে লাগল।

সকাল থেকেই খুকীকে নিয়ে টানাটানি। মায়ের মামীমা কোলে করে দুধ

খাওয়ান। মায়ের মামাতো ভাইবোনেরা কেউ বাগানে বেড়াতে নিয়ে যায়, কেউ ছবির বই দেখায়। মামাতো ভাইএরা অর্থাৎ খুকীর মামারা বাড়ী ফিরবার পথে খেলনা, জামা, কাপড় এনে হাট বসায়। মাসীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, খুকীর কি নেই? তাকে দাও সে সব। দিদিমা হাতের বালা গড়িয়ে দিলেন। সাহেব বাড়ীর জুতো, মোজাপরা, গোলাপী ভেলভেটের ফ্রকে সজ্জিত খুকীকে দেখে খিদিরপুরের ব্যারাক-কন্যা বলে চেনা গেল না। পরভৃতের মত খুকী বেড়ে উঠতে লাগল।

এখানে এসে বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমই হোত খুকীর। বাবা খিদিরপুরে যেন একটা প্রকাণ্ড অস্তিত্ব নিয়েছিল। যেদিকেই পা বাড়াও বাবার ছায়া যেন চোখ পাকিয়ে আছে। জোরে কাঁদ, পিঠে পড়বে ঘা। বিরক্ত কর, নড়া ধরে ঠাস করে শক্ত মেজেতে শক্ত দুটো হাত বসিয়ে দেবে। অনেক রাত্রে কিসের যেন গোলমাল হোত? আলোজ্বলা ঘরে এক ঘুমের মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে খুকী বাবার তাণ্ডবে। বাবা ভয়ঙ্কর বস্তু, তখন আরো ভয়ঙ্কর একটা কিছু হয়। বালিশ আঁকড়ে শুয়ে মুখ গুঁজে থাকে খুকী মাতাল বাবাকে দেখে। ভয় হয়, কি একটা বুঝি কুটোর মত ওকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে কোথায়। কিছু স্থির নেই খুকীর জগতে, কোথাও আশ্রয় নেই।

সেই বাবা যেন হাতী থেকে মশা বনে গেছে। ভাল মানুষের মত খায় দায়, শোয় বসে। সাধারণ মানুষের মত হয়ে গেছে ও। সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, শোনা যায় চাকুরি খুঁজছে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে রেডিও শোনে, কাগজ পড়ে। নিজেদের ঘরটাতে চিৎ হয়ে শুয়ে সময়ে অসময়ে ঘুমোয়। সে সময়ে খুকী গোলমাল করলে চোখ পাকিয়ে চড় তোলে আগের মতই। কিন্তু কি ভেবে মারে না। বাড়ীর লোকেরা কেউ এসে পড়লে রাগীমুখে হাসি টেনে খুকীকে লোকদেখানো আদর করে। এখানে এসে রাতারাতি খুকীর মূল্যটা বেড়ে গেল বুঝি। খুকীকে বড়লোক আত্মীয় আদর দিয়ে মা-বাবার চক্ষে মূল্যবান করে তুলল।

ভোরে উঠেই মা, খুকীর মুখ-হাত ধুইয়ে চোখে কাজল, কপালে টিপ পরায়, যাতে খুকীকে সুন্দর দেখাবে। আগে, এক প্রহরের আগে খুকীর মুখটা মুছিয়ে দেবার সময় পেত না মা। তন জামা কাপড় পরে খুকী টলতে টলতে বেরিয়ে

আসে। দিদিমার দরজায় ঘা দিয়ে ডাকে, "মা, মা, ওগো"! প্রথম দিনের ডাকের পরেই দিদিমাকে 'মা' বলতে খুকীর মা বিশেষ করে শিখিয়েছে। বিশেষ করে দিদিমা, দাদামহাশয়ের সামনে খুকীকে তুলে ধরা হচ্ছে। বিশেষ করে মামাতো ভাইবোনদের ভালবাসা পেতে শেখানো হচ্ছে খুকীকে। খুকীর মা-বাবার ভরসাস্থল খুকী। খুকীকে অবলম্বন করে, তারা আজ এখানে আশ্রয় পেতে চায়। ওঁরা খুকীকে এত ভালবাসেন, খুকীকে আশ্রয়চ্যুত করবেন কি করে?

তবু, খুকীর আকাশে কাল ছায়া ঘনিয়ে এল। দুই মাস হয়ে গেল ভাগ্নী, ভাগ্নীজামাই নড়বার নাম করে না। এ বাজারে এত বাড়তি খরচ কতদিন সওয়া যায়? তাছাড়া, জামাই একটু একটু করে আবার কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে! ধীরে ধীরে রাত করে বাড়ী ফেরে আবার। কোনদিন খায়, কোনদিন খায় না। চোখ লাল, কথা জড়ানো। খুকীর মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। আড়ালে খুকী শোনে মা বাবাকে কি সব বোঝায়। কখন কাঁদে, কখন রাগ করে। খুকীর বুকের মধ্যে অজানা অস্বস্তিতে কাঁপে। একটা ক্ষতি বুঝি হ'তে যাচ্ছে ওর! আবার ঘরের বাইরে এসে ভুলে যায় খুকী। মনের আনন্দে, শরীরের আরামে খেলা করে বেড়ায়।

একদিন ফিরে এল খুকীর দুঃস্বপ্ন। রাত্রে ঘুমভাঙ্গা চোখে দেখল বাবার লাফালাফি, গালাগালি। মায়ের কান্না শুনল ও—পায়ে পড়ে কান্না। ভয়ে খুকীর গলা শুকিয়ে গেল। মনে হ'ল বাবার এই ভুলে-যাওয়া অস্তিত্বের সঙ্গে যোগসূত্রে গাঁথা আছে তার দুর্ভাগ্য—খিদিরপুরের সেই ভাগ্য!

ভদ্রপাড়ায় ভাগ্নী-জামাইএর মাতলামী মামা বরদাস্ত করতে পারলেন না। কাজের মানুষ তিনি, এতদিন ধরে নিষ্কর্মার অন্ন ধ্বংস দেখে রাগে ফুলছিলেন। মাতলামীর সুযোগ ধরে খুকীদের সরাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। জামাই যে চাকুরি খুঁজবার ছুতো ধরে সারাদিন আড্ডা দিয়ে ফিরছে, এ তথ্য তাঁর কাছে স্পষ্টই ছিল। উদ্যোগী হয়ে একটি চাকুরি জুটিয়ে দিলেন তিনি। খিদিরপুরের সেই ব্যারাকটি তখনও খালি ছিল। বাকী ভাড়া মিটিয়ে খুকীদের ফেরবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

এবার মাইনে আগের চেয়ে কম। মামী বললেন, "কি করে চলবে ওদের? বাচ্চাটা কি একটু দুধ পাবে না?"

বুদ্ধিমান মামা উত্তর দিলেন, "কম মাইনেই ভাল। কষ্ট করে খেতে হ'লে মাতলামীর পয়সা থাকবে না।"

খুকীর মাসীমা বলল, "কি করে ওই ঘিঞ্জি খিদিরপুরে থাকবে ওরা?"

মামা উত্তর দিলেন, "এতদিন যেমন করে ছিল, বা ভবিষ্যতে যেমন করে থাকবে। আমি কতদিন আর একটা সংসার চালাব? আমার বয়স হয়েছে, এখন আমি মাতাল অকর্মাকে পুষতে পারব না।"

কথাটা সত্যি। মন খারাপ হলেও প্রত্যেকে মন শক্ত করে নিল। মনে সান্ত্বনা পেল এই ভেবে, বালীগঞ্জ থেকে খিদিরপুর কতটা আর দূরে? খুকীকে প্রায় দেখে আসবে তারা, আনিয়ে কাছে রাখবে। খুকীর বিদায় পর্বের আয়োজন আরম্ভ হ'ল। নানা উপহার, মায় বার্লি-সাগুর টিন পর্যন্ত সঙ্গে দেবার জন্য এল। অধ্যাপিকা মাসী স্থির করলেন মাস-মাস খুকীর দুধের দাম গোপনে ভগ্নীর হাতে যোগাবেন।

বিদায়ের দিন এসে গেল। খুকী রোজকার মত উঠেছে সকালে। ভোরের আলোয় ফুলে-ভরা বাগানে রোজকার মত বেড়িয়েছে। তখন কি জানে খুকী যে এই সুন্দর জগৎ মিলিয়ে যাবে এখনি? বাঁধা ব্যারাকে নোংরা ধূলোর মধ্যে খুকীর পুরণো ক্ষুধার্ত ব্যথিত দিনগুলো ফিরে আসবে?

বাড়ীর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। খুকীর বাবা কাঁচু-মাচু মুখে বসে আছে কোণে। খুকীদের আদি মালপত্রের সঙ্গে যোগ হয়েছে নূতন উপহার। খুকীর মা কাঁদতে কাঁদতে বসল উঠে। সকলের চোখে জল, খুকী কিন্তু হাসছে। অবুঝ শিশু বেড়াতে যাবার আনন্দে মশগুল। আজও তার চোখে মাণিক জ্বলছে, ঠোঁটের হাসিতে মুক্তো ঝরছে। খুকীকে ওর মায়ের কোলে তুলে দিলেন দিদিমা। দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এতক্ষণে খুকী বুঝতে পারল সে একা কোথায় যেন চলেছে। এরা কেউ তার সঙ্গে নেই। দিদিমাও যাচ্ছেন না। এতক্ষণে খুকীর হাসি ফুরিয়ে গেল। বেড়াতে যাবার আনন্দ ভুলে সে নেমে আসবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। মাকে ছেড়ে সে দিদিমার দিকে হাত বাড়াল, কেঁদে উঠে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল তাকে দূরে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার।

দিদিমা চোখে আঁচল দিলেন, কিন্তু খুকীকে বুকে তুলে নেবার জন্য হাত

বাড়ালেন না। গাড়ী ছেড়ে দিল। খুকীর চাউনীর, হাসির মুক্তা-মাণিক বৃথাই ঝরল। তাকে চলে যেতেই হ'ল

মূর্খ অবুঝ খুকীর তবু অজ্ঞানতিমিরে সান্ত্বনা আছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফলতো সে খায়নি। অনেক কিছু না জেনেই সে চলে গেল। অনেক কিছুই সে জানে না। কিন্তু আমি, আমি তো জানি। আমি সব জানি।

খুকী জানে না স্রোতের জলের মত মানুষের মন। স্রোতোবেগে পুরণো তীর ভেঙ্গে ফেলে নূতন চর জাগিয়ে চলে। গতিই তার জীবন। বিস্মরণীর বালুবেলাতে ঢেকে দেয় অতীতের পলিমাটীবিছানো শ্যাম শষ্প-ভূমি। মানুষ ভুলে যায় স্বাভাবিকভাবে। খুকী জানে না, যে বাড়ী এত আদরে কোল বাড়িয়ে রেখেছিল তার জন্য, একদিন নূতন শিশুর আগমনে তাকে ভুলে যাবে নিঃশেষে। খুকী জানে না, অধ্যাপিকা মাসী দু'মাস খুকীর দুধের দাম জুগিয়ে তিন মাসে বিরক্ত হবে। অসংখ্য সখের খরচের মধ্যে মাতালের মেয়ের দুধের দাম ভারী লাগবে। চার মাসে মাসী বন্ধ করে দেবে। খুকী জানে না, বড়লোকের অসংখ্য খেয়ালে গরীব আশ্রিতা বিলীন হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। বার্লি-ডাল-মুড়ি নিয়ে নোংরা ব্যারাক খুকীকে আবার গ্রাস করে ফেলবে। খুকীর, সৌন্দর্য,-মনোহারিত্ব, পেট ভরে আহার, সুস্থ পরিবেশে বাস—এ সব যোগাতে পারবে না, পারল না। অনাহারে, অচিকিৎসায়, আলো-বাতাসের অভাবে যখন খুকীর সমস্ত শরীরে ক্ষয়রোগ বাসা বাঁধবে, যখন মাতাল বাবার অত্যাচারে, স্নেহহীনা মায়ের অযত্নে ফুলের মত শরীরটি তার শুকিয়ে যাবে; তখনও খুকী জানবে না যে একদা খুকীর মৃত্যু-সংবাদ এদের কানে পৌছলেও কেউ খুকীর জন্য এক বিন্দু চোখের জল ফেলবে না।

অজিত মিশ্র পাশের পড়ার টেবল থেকে মাথা তুলল। ফর্সা রংএ কালো পুরু কাঁচের চশমা, কোঁকড়ানো চুল। ডোরাকাটা সার্ট, পায়ে চপ্পল। টিপিক্যাল বি-এ পরীক্ষার্থী কিশোর। কথায় কথায় লাজুক হাসি হাসে, সিঁড়ি বেয়ে ওঠে দৌড়ে। চঞ্চলতার প্রতিমূর্তি।

সকালবেলা কাক ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে কাংস কণ্ঠে পাশের বাড়ীর গিন্নী তাড়না করছেন ঝিকে—"আমার মেহগনি দেরাজের ওপর এঁটো চায়ের কাপ! জানিস, দেরাজটার দাম কত?"

অজিত ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগল দীর্ঘ এক পাতা জোড়া ভাবনা—বড় পিসীর যে কি কাণ্ড! পাশের বাড়ীখানা খালি হ'তে হ'তেই কোথা থেকে নিজের কবেকার স্কুলে-পড়া বন্ধুনীকে সেধে এনে বসালেন। এখন বাড়ীশুদ্ধ সকলের প্রাণ যায়-যায় হয়েছে। সব সময় চেঁচামেচি লেগেই আছে। গয়না আর শাড়ীর গল্প—বড়লোকী চাল। অজিতের মাথার ওপরেই বড় পিসীর অধিষ্ঠান অর্থাৎ তেতালার ওপরের ঘরখানা তাঁর বৈধব্যের নীড়। সঙ্গে লাগাও ছোট আড়াই হাত ঝুল বারান্দা। ওখানে দাঁড়িয়ে বন্ধুপ্রীতি ঝালান তিনি দিনরাত। ফলে, নীচের ঘরে অজিতের পাশের পড়া ফেল হয়ে যায়।

"ও প্রীতি, করছিস কি?" বড় পিসীর ঘুমভাঙা, আধো আধো, বন্ধুপ্রীতিতে বিগলিত গলা শুনে প্রীতিময়ী হাঁক দিলেন, "কে ইন্দু? দাঁড়া, দোতালার গাড়ী

বারান্দায় আসছি।" স্থূলাঙ্গিনী প্রীতিময়ী নিয়োগী হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়ালেন এসে অজিতের সামনে গাড়ীবারান্দায় একেবারে মুখোমুখি। অজিত লজ্জা পেলেও তাঁর লজ্জা নেই।

"জানিস ভাই ইন্দু, এই ঝি-বেটীর আক্কেল দেখ! অমন দামী দেরাজটায় দাগ ধরিয়ে ছাড়ল! সবে সেদিন কিনেছি নীলাম থেকে।"

"কেনরে, কি হ'ল?"

ইন্দুর সাগ্রহ প্রশ্নে প্রীতির দুঃখ উথলে উঠল। চলল দীর্ঘ আক্ষেপ-- প্রায় বীরবাহুর মৃত্যুতে মহিষী চিত্রাঙ্গদার মতই। একজন ছাত্রের যে মুখের সামনে চেঁচামেচিতে পড়া নষ্ট হচ্ছে, খেয়াল নেই। অথচ দু'জনেই নাকি সেকালে বীটন স্কুলের ম্যাট্রিক পাশ। সে শিক্ষাটুকু কবে ধুয়ে মুছে গেছে। প্রীতি পঞ্চ সন্তানের জননী হয়েছেন। আর, বড়পিসী ইন্দুবালা নিঃসন্তান, বিধবা—চল্লিশ বছরের ধুমসী।

ধুমসী, ধুমসী! নিজের মনে অজিত কথাটা উচ্চারণ করে শান্তি পেল। মা শুনলে রাগ করতেন! বড় বড় চোখ পাকিয়ে বলতেন, "আবার খোকা অসভ্য কথা বলছ?" ওঁদের সভ্য-অসভ্যের মাপকাঠির জ্বালায় শব্দ-অভিধানে ভাল ভাল কথা উঠিয়ে দিতে হয়।

প্রীতিময়ী চোখ টেনে বললেন, "দেখ ইন্দু, আজ একবার বিকেলে বেরোতে পারবি, আমার সঙ্গে? তাহলে, এম, বি, সরকারে যেতাম।"

"তা, যেতে পারি। আমার আর কি কাজ, বল? ঘরই নেই, তার ঘরের জ্বালা!" মোটাসোটা ইন্দুবালা শিবনেত্র হয়ে একটা নিশ্বাস ফেল্লেন—"তা, এম, বি, সরকারে কি দরকার?"

"আর ভাই, একটা না একটা লেগেই আছে। কদিন পরেই খুড়তুতো বোনের ছেলের বৌভাত। একটা পজিসন্ আছে তো আমার? সেদিন ভাইঝির বিয়েতে সাড়ে চার ভরির হাঁসুলি দিলাম। ওরা দেখল প্যাট-প্যাট করে। আজ কেননা ভরি দুইএর ফুল দিতে হবে?"

"হ্যাঁ ভাই, তাতো বটেই। সবাইকার বিয়ে হয়, শুধু ভগবান আমাদের নবতারাকে চোখে দেখেন না।"

নবতারা, ওরফে তারা, অজিতের ছোট পিসী, এম-এ পাশ করে বাড়ী

বসে আছে বিয়ের আশায়। মাঝে মাঝে অজিতের বাবা দুঃখ করেন, "বোনটার আর বিয়ে দিতে পারলাম না।"

সকলের যার জন্য এত দুঃখ, তার সুখী-সুখী মুখখানা অজিতের চোখে ভেসে এল। কোঁকড়াচুলে-গাঁথা পদ্মের মত মুখ। নিজের ঘরে উপন্যাস পড়েন, সেলাই করেন। ওঁর কাছে প্রায়ই প্রমথবাবু আসেন। একসঙ্গে পড়াশোনা করছেন কিনা দু'জনে।

একদিন অজিত দেখেছে হঠাৎ—ছোট পিসির হাত ধরে প্রমথবাবু টানাটানি করছেন। অজিতকে দেখে অপ্রতিভ তারা বলে উঠেছিল, "ও—খোকা, চিঠির বাক্সটা দেখে আয় না।"

কি সব বাজে কথা-বলা সপ্রতিভ ভাব দেখাতে! অজিত বেশ বুঝেছিল। তবু, ধুমসী, মোটা, কালো বড় পিসির থেকে ছোট পিসি নবতারাকেই ভাল লাগে—উনি পাপ করলেও অজিতকে কখনও শাসন করেন না।

এসব কথা পরীক্ষার আগে ভাবা উচিত নয়—কে কার হাত টানে। এ পাপের কথা। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে চিন্তাটা দূরে সরিয়ে অজিত পড়ায় মন দিল—

"Friends Romans, Countrymen, lend me your ears···
······Lend me your ears—"

দূর ছাই! কানের কাছে প্রীতিময়ীর স্বরলহরী—"দু'খানা ভাল ভাল বাঙ্গালোর কিনলাম। পরেনি, আর ক'টা দিন—" এখনিতো তোমার ও শাড়ী পরা উচিত নয়—বুড়ো ধুমসী! "তা পঁচাত্তর টাকা করে দাম নিয়েছে। ভালই পেয়েছি, কি বলিস?"

"আমি আর কি বলব, প্রীতি? রঙীন শাড়ীর পাট তো আমার নেই। গত বছর দেওরের বিয়ের শাদা বাঙ্গালোর প্রণামী একখানা পেয়েছিলাম। দেখেছিস তো।"

"ভাবছি, আর একখানা কিনব,—অ্যাশ রংয়ের—"

অজিতের আর সহ্য হল না। মুখের ওপর জানালাটা বন্ধ করে দিল। খিল্‌খিল্‌ হাসির শব্দ শোনা গেল—"ও ইন্দু, তোর ভাইপো যে লজ্জায় জানালা দিলে। হো, হো, হা, হা। ভাই, ওর সঙ্গেই আমার রিনুকির বিয়ে দেব ঠিক।

ছেলেটিকে আমার ভা-রি ভালো লাগে। তখন বন্ধুর মান রাখতে হ'বে

ইন্দুবালার শানে-থপ-করে ভিজে-কাপড়-পড়বার মত থপ্‌থপে গলা শোনা গেল, "সতেরো বছর মোটে খোকার! আগে দেখ্‌ তো মানুষ হয়, কি ভূত হয়।"

প্রীতিময়ীর ক্যান্‌কেনে গলা বেজে উঠল, "একটি মাত্র মেয়ে আমার। যৌতুকে তোদের বাড়ী ঢেকে দেব, জানিস? সারা রাজ্য কিনে দিয়ে তবেই জামাই কিনব। কড়িতে কি না বশ হয়, ইন্দু? ছাঁদনাতলার ছড়াতেই না আছে—

'কড়ি দিয়ে কিনলাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম'—

অজিত কানে আঙুল ঢুকিয়ে ঝুঁকে পড়ে একমনে পড়তে লাগল—
"—Lend me your ears—I have como to bury Caezar—"

হুঁ, ওই রিন্‌কিকে সে বিয়ে করবে না হাতি! বয়ে গেছে অজিতের। অমন মায়ের মেয়ে! রক্ষা কর, বাবা। বড় হয়ে ওই মায়েরই নকল দেখে, সর্বদা চীৎকার আর—টাকার গপ্‌পো! হুঁ!

"—And not to praise him To bury Caezar—"

দেখতেই বা কি? ধুমসী মায়ের ধুমসী মেয়ে। বিয়েই যদি কস্মিনকালে করতে হয় তাহলে, এই যে। বিয়াত্রিচের ছবি। কেমন পাণ্ডু মুখ, অথচ কি চমৎকার দেখতে! পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে চেহারা। মোটা হ'লে মেয়েদের বিশ্রী দেখায়। নবতারার মধ্যে ক'দিন অসুখ হয়েছিল। অজিত লক্ষ্য করে দেখেছিল বেশ দেখাচ্ছে ছোট পিসীকে। কেমন বেচারী শুকনো ভাব। বারান্দায় বেতের চেয়ারে তারা বসেছিলেন। রাস্তা দিয়ে উঠে আসতে আসতে প্রমথবাবু বলছিলেন—

"—Pale, Pale thy lovely checks—"

কেন যে এরা প্রমথবাবুর সঙ্গে নবতারার বিয়ে দেয় না? চমৎকার লোক! অসবর্ণ, না কচু? দিলেই হয়।

কিন্তু, মা-বাবা কড়ির লোভে যদি ওই রিন্‌কিটাকেই বাড়ী আনেন? যদি

তার বিয়ে দেন জোর করে? দড়ি দিয়ে বেঁধে নেবে ওই ধুমসী? অজিতের কান্না এসে গেল।

দিলেই হ'ল? সে বিদ্রোহ করবে, এটা বিদ্রোহের যুগ। সে বিয়েই করবে না—চিরকুমার থাকবে। নেহাৎ বিয়ে করতে হলে—হ্যাঁ, ওই।

অজিতের কথা চুকে গেল।

ইন্দুবালার আজ আবার একাদশী। বসেছেন পারণ সাজিয়ে, দই, চিঁড়ে, কলা, সন্দেশ, আম। প্রায় পাঁচ টাকার জিনিষ দুর্মূল্যের বাজারে সাজানো হয়েছে সামনে। বিধবা ননদের একাদশী এলে অজিতের মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। চার পাঁচবার মিছরির সরবৎ, বেলের পানা চালানোর পরে রাত্রির খ্যাঁট—কড়াভাজা লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, রাবড়ি। শুধু একবেলা ভাতের বদলে কত প্রস্থে খাওয়া চলে, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইন্দুবালার একাদশী। দু'বার একাদশীর খরচে একজন লোকের মাসের র‍্যাশন আসে।

বলার উপায় নেই। বিধবা মানুষ, বাপের বাড়ী শান্তির আশায় রয়েছেন এসে। দস্তুরমত শ্বশুরবাড়ী থেকে পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা আসে। সুতরাং, মেজাজ আছে।

ইন্দুবালা চোখ এক হাতে ঢেকে মাথা নামিয়ে আমের আঁটি চুষছিলেন একমনে। থপ্‌র থপ্‌র পায়ের আওয়াজে চোখ তুল্লেন। প্রীতিময়ী আসছেন ভরদুপুরে। হাতে চারটে ল্যাংড়া আম।

"ও ইন্দু, বসে গেছিস্? উনি এইমাত্র পোস্তা থেকে এক ঝুড়ি নেংড়া আম পাঠালেন। আজ তোর একাদশী। ভাবলাম দিয়ে যাই। এমন ভাল আম তো এখানে বাজারে পাওয়া যায় না।"

অজিতের মা বের হয়ে এলেন খাবার ঘর থেকে—"বা, খাসা আম দেখছি। কত বড় সাইজ!"

"হ'বে না? এ যে ভাই, টাকায় প্রায় দু'টি করে পড়ল। তাতেও যদি না বড় হয়, তবে হ'বে কিসে? ওনার আবার ছিঁড়ে-ছিঁড়ে জিনিষ কেনায় বড় ঘেন্না। একেবারে ঝুড়ি ধরে আনা চাই। ফেলে ছড়িয়ে খাও।"

অজিতের মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, "সবাইকার তো বেশী আনবার ক্ষমতা থাকে না।"

"তা বটে, তা বটে"—প্রসারিত পদে জলচৌকিতে প্রস্থ ধরিয়ে বসলেন প্রীতি হাসিমুখে। দেরী সইল না, পায়ের সঙ্গে হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ঝক্‌ঝকে নূতন একজোড়া চূড়, গিনি সোনার।

"চূড়টা দিয়ে গেল সকালে। ভাবলাম দেখিয়ে আসি।"

প্রীতির আত্ম উপঢৌকনের মূল তা'হলে চূড় জোড়া?

"বেশ হয়েছে, প্রীতি।" প্রসন্ন স্বরে ইন্দু বললেন, "ও তারা, দেখে যা প্রীতির হাতে চূড়ের নমুনা। তোর পছন্দ হয়?"

বিরক্ত মুখে নবতারা বেরিয়ে এল খাবার ঘর থেকে। সবে খেতে বসবে, এ হেন সময়ে দিদির বন্ধুর চূড় দেখা মনঃপূত হয়নি তার। দিনরাত্রি প্রীতি-দির মুখে শাড়ী আর গয়নার গল্প আর নিজের টাকার গুমোর। সামনে যেতেও প্রবৃত্তি হয় না। গেলেই বিনা কারণে নিজের ঐশ্বর্য বিজ্ঞাপিত হ'বে। কবে চূড় গড়ালাম, কবে ধনেখালির শাড়ী কিনলাম, কবে বোনঝিকে পাঁচ ভরির বালা দিলাম, কবে রাজসূয় যজ্ঞে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলাম, এইসব। গা জ্বলে যায়। আর কোন টপিক্‌স্ কি জানা নেই ভদ্রমহিলার? দিদি যে কি এক আপদকে পাশের বাড়ীতে বসিয়েছে? যখন তখন এমনি অবাঞ্ছিত সঙ্গ।

আচ্ছা, দিদির রাগ হয় না? যে ধরণের কথা এক নিমিষে তার অঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়, দিদি সাগ্রহে সানন্দে অহরহ সহ্য করছে? আহা, দিদি বিধবা, দিদির বন্ধু নেই। দিদি বঞ্চিতা বলেই অন্যের ভোগ, সুখের গল্প সহ্য হয়। দিদির যে তুলনা করে জ্বলবার কিছুই নেই!

নবতারা আধুনিকী, সুতরাং নবতারাকে দেখে প্রীতা হলেন প্রীতি,—"দেখ তো তারা, তোমাদের লাগছে কেমন? পাকা সাত ভরি ওজনে, মজুরী নিল নব্বই টাকা।"

"বেশ হয়েছে। এখন কর্তাকে দেখান গে—" রূঢ়স্বরে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে নবতারা দোতালায় চলে এল। প্রমথ আজ দিন দশেক আসে না। কোন খবর নেই! তার এখন এসব ভাল লাগে না। ষ্টুপিড্ মায়ের স্বদেশে স্ববংশজাতার পাণি-গ্রহণে সম্মত হল কি না, কে জানে?

প্রীতিময়ীর হাসিখুশি মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। অজিতের মা বঁটি পেতে আম কুটে দিচ্ছিলেন বড় ননদের 'পারসে'। ছোট ননদের রূঢ়তা ঢেকে বলে উঠলেন, "গড়ন আপনার চমৎকার, সব গয়নাই মানায়।"

"মানাবে না? বানি আর সোনা দিলেই মানানসই গয়না হয়। মিন্‌মিনে হাওয়ায় ওড়া গয়না কি ভালো? আমি, বাপু, ওজনে রাখি, তাই এমন রূপটি হয়। এই তো, রিনকির জন্মদিনে একছড়া মটরমালা দিলাম। তার ভাই, সুতোটি পর্যন্ত সোনার দিয়েছি। এত্ত ভারী যে, মেয়ে পরতেই চায় না। ভাবছি, নূতন প্যাটার্ণের এক জোড়া চুড়ি গড়িয়ে নেব মিনাকাজের। কি বল, বৌদি?"

অন্যদিন এসব কথা অজিতের মায়ের বিশেষ ভালো লাগে না। শোনারও সীমা আছে। প্রীতির কথা সব সময় ধাতুর খাদে বয়—সোনা, রূপো, তামা, দস্তা ইত্যাদি। তবে আজ নবতারার উত্তাপ ঢাকতে অজিতের মা একেবারে বদ্ধপরিকর। তাই সুরে সুর দিয়ে বল্লেন, "নিন না করে, প্রীতিদি। ভালো দেখাবে আপনার হাতে। তা এত বেলায়, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি? একটু সরবৎ করে দি?"

"না, না। বাড়ী ফিরে খাব। সকালে এমনি এক গ্লাস বাদামের সরবৎ খেয়েছি, সঙ্গে নূতন ঠাকুর জোর করে কয়খানা মাছের চপ ভেজে দিল। পেটে জায়গা নেই। নিজের হাতে খাবার করলাম কি না আজ, তাই একটু দেরীই হয়ে গেল।"

প্রীতি-প্রদত্ত আম্রলেহনতৃপ্ত গলায় ইন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, "লোক খাবে না কি আজ?"

"সে ভাই, কবে না খায়? কর্তার এক বাতিক লোক খাওয়ানো। দেখাদেখি ছেলেরাও কি তাই শিখেছে? এই লোক নেমতন্নো, সেই লোক নেমতন্নো! যজ্ঞের রান্না লেগেই আছে বাড়ীতে আমার। আজ বড় ছেলে স্কুলের বন্ধুদের বলেছে। গরমের ছুটী হয়ে গেল কি না। এ আমার কবে না আছে, বল?"

অজিতের মা কথার মোড় ঘুরিয়ে বল্লেন, "কি কি খাবার তৈরী করলেন?"

প্রীতি স্ফীতি লাভ করলেন আত্মপ্রসাদে। পা দু'খানি আর একটু ছড়িয়ে

হাত নেড়ে সুরু করলেন—"তা, পোনেরো সের দুধ রেখে বাড়ীতে ছানা কাটিয়েছি। এমনি বড় বড় শাদা শাদা সন্দেশ করলাম গোটা গোটা। দু'খানা শ্বেত পাথরের থালায় সাজিয়ে রেখে এলাম। ক্ষীর করলাম এতখানি। ক্ষীরের পুর দিয়ে মালপো ভাজলাম—দু'টি গামলা ভরে। বগি থালায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে রেখে এলাম এমনি করে লবঙ্গলতিকা। এতেই কি হয়? প্রায় দশ সের মাছ এল। গ্যাস জ্বালিয়ে লেগে গেল ঠাকুর মাছের চপ ভাজতে। বাদাম পেস্তা দিয়ে পুর মাখালাম। ছেলে এসে আরও যা বাৎলায়—করতেই হবে। এক ঝুড়ি আম তো এনে রেখেছি। ভাঁড়ারে আর কুলোয় না আমার। ভাবছি বাড়ী তৈরীর সময় দু'টো ভাঁড়ার বানাব—"

পাশের বাড়ীর দিকের জানালাটা বন্ধ করে অজিতের বাবা বিরক্ত স্বরে বল্লেন, "সারাদিন পরে একটু ঘুমোতে না পেলে আর তো বাঁচা যায় না! ইন্দু কি ফ্যাসাদ এনে ফেলল কানের গোড়ায়।"

অজিতের মা ক্ষীণস্বরে বললেন, "শিগগি রই নিজের বাড়ী ওঁরা করছেন। উঠেই যাবেন তো।"

"রাখো, রাখো। স্বামীর যা রোগ, আর স্ত্রী যা খর্চে, তাতে বাড়ী করবে হয় কে জানে? ভদ্রলোকের পাড়ায় যত সব!"

বাবা শয্যা গ্রহণ করলেন। মা কৌতূহলী হয়ে খড়খড়ির ফাঁকে উঁকি দিলেন। প্রীতিময়ী চুপ করে বসে আছেন, খাটে লম্বমান স্বামী। স্বামী কথা বলে চলেছেন পূর্ণগতি পাখার সঙ্গে তাল রেখে। প্রীতিময়ী একমনে শুনছেন, আজ তাঁর মুখে কথা নেই। স্বামীর বাক্য থেকেই স্বামার রোগ প্রমাণিত হ'বে।

"যতসব! যতসব! আরে, মানুষ জন্মায় কেন? থাকে কি নিয়ে? নেশা, নেশা, নেশা! বলি, ওগো বিদ্যেধরী, শুনছ? খাবো না তো কি তোমায় নিয়ে ঢলাঢলি করব? মদ খেওনা কেন, কেন? ওরে আমার কেরে, তপ্ত দুধে মণ্ডা ফেলে দেরে। যতসব! যতসব! টাকা আমার, খাই আমি। শুনছ গো বিদ্যেধরী—"

নবতারা মাঝে মাঝে প্রমথর সঙ্গে গোপনে দেখা করত। কাপড় জামা কিনবার নামে, বন্ধুর বাড়ী যাবার নামে বেড়িয়ে আসত বিধবা দিদির খরদৃষ্টির আড়ালে। প্রমথ বৈদ্য, তারা ব্রাহ্মণ। সুতরাং পাত্র হিসাবে মনোনীত হ'লেও কন্যাপক্ষের দ্বিধা কাটছিল না।

আজ এক গজ ছিট কিনবার নাম করে পথের মোড়ে দু'জনে মিলিত হয়েছে। কাছেই পার্ক, সন্ধ্যা ঘনীভূতা। বেঞ্চে উভয়ে বসল ও পর মুহূর্তে কথায় ডুবে গেল।

"তোমার বেকারত্ব না ঘুচলে বিয়ে করব কিসের জোরে?"

তারার সাভিমান অনুযোগে প্রমথ মজুমদার মৃদু হাস্যে উত্তর দিল, "করবে নিজের জোরেই। যদি সে জোর না থাকে, কোর না।"

"বিয়ের পরে এ বাড়ীতে তো স্থানাভাব হ'বে। উঠব কোথায়, শুনি?"

"উঠবে আমার ভাঙ্গা-চোরা বেনেটোলার পৈত্রিক বাড়ীতে।"

"তারপরে?"

"আমার টিউশনী, তোমার বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ও রন্ধন। সেখানে মানিয়ে চললে, আর যা হোক স্থানাভাব হ'বে না।"

"হবেই বা কেন? আমি তো জাতে বড—আমি ব্রাহ্মণ।"

"তা বটে।"

নবতারা রাগে জ্বলে উঠল, "সব কথাই তোমার সংক্ষিপ্ত। তার মানে তুমি বিয়ে চাও না?"

"তাহলে দু'বছর ধরে কুকুরের মত স্বামিনীকে অনুসরণ করছি কেন?"

"টাকা ছাড়া দিন চলে না, স্বীকার করনা কেন? সিরীয়াস হয়ে চাকুরি খোঁজা দরকার।"

প্রমথ একটা সিগারেট ধরাল। উর্ধ্বমুখে ধূম ত্যাগ করে বলল, "জাতের মোহ বড় প্রবল!"

"তার মানে?"

"টাকাও তো একটা জাতই বটে। তা, প্রীতিময়ীর খবর কি?"

"হঠাৎ তাকে এখানে কেন?"

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা—ক্ষণসঙ্গে কত হয়। এ তো অহরাত্র প্রতিবেশীত্ব।"

তারপরে উভয়ের কথা অন্য খাতে প্রবাহিত হ'ল। প্রীতিময়ীর প্রভাব বা সান্নিধ্য একটি পরিবারের প্রত্যেকের ওপর কেমন কাজ করেছে জানিয়ে এ দৃশ্য এখানেই শেষ করে নন্দনতত্ত্বের নির্দেশ মেনে চলতাম। কিন্তু, হায়, আমার গল্প যে শেষ করতে হ'বে। সুতরাং—

থপ্‌র থপ্‌র! কাছেই বাড়ী, ওই রাস্তায় এসেছিলেন প্রীতি। বেঞ্চে বেসামাল হ'য়ে বসেছিল দু'জনে রাস্তার দিকে মুখ করে। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল।

সন্ত্রস্ত যুগলের পাশে বসলেন প্রীতি পার্কে প্রবেশান্তে হাঁপাতে হাঁপাতে।

"এই যে প্রমথ, কেমন আছ? অনেকদিন ইন্দুদের বাড়ী যাওনা, না?" সিগারেটটা পাম্পশুর তলায় দলন করতে করতে প্রমথ তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "না, তা, হ্যাঁ যাই বই কি। আজ এই এখানে—একটু বেড়াতে বেড়াতে—"

তীব্র দৃষ্টিতে প্রমথর দিকে চেয়ে তারা বাধা দিল, "মানে, আমি ছিট্ কিনতে দোকানে এসেছিলাম। প্রমথবাবুও রুমাল কিনতে এসেছিলেন! দেখা হয়ে গেল, আর কি?"

"তা বেশ, কেনাকাটার ব্যাপারেই তো দেখাশোনা হয় আজকাল। বাড়ী যেয়ে দেখা করা না ঘটলেও দোকানে তো আসা চাই-ই। তা, কেমন ছিট্ কিনলে, দেখি?"

বিপন্ন নবতারা প্রমথর মুখের দিকে তাকাল। হাত যে শূন্য! প্রমথ একটু হাসল মাত্র। কোন সাহায্য দেবার আশা নেই ও মুখে।

তারাকে ত্রাণ করিয়ে প্রীতি নিজের হাতের বাদামী মোড়কটি খুলে ফেললেন, —"আমিও কিনলাম কিছু। আজ বেশী জিনিষ নিইনি। গরমে জামা করতে চার গজ আদ্দি আর বোনঝি—জামাইকে দেব একজোড়া ফুলপেড়ে ধুতি। তা, শান্তিপুরীই পেলাম, একেকখানা সাড়ে উনিশ করে নিল। ভাবছি, একখানা না হয় কর্তার জন্য রেখে দেব। আদ্দি সাড়ে চার টাকা গজ নিল, কিন্তু, বাছা কাপড় একেবারে।"

নবতারা ভ্রূকুঞ্চন করল, প্রমথ নীরবে চেয়ে সওদা দেখতে লাগল। প্রীতি

নিজের মনে বলে চললেন, "আমি বাজে জিনিষপত্র কেনা পছন্দ করিনে। সস্তার তিন অবস্থা! ফেল কড়ি মাখো তেল, মাখো তেল ফেল কড়ি। কড়ি ফেলে সারা পৃথিবীটাই কিনতে পারা যায়।"

নবতারা প্রেমে বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছিল। নিজে একটি দারুণ সমস্যার মুখোমুখী পড়েছে, অর্থাভাবে বিবাহে বাধা। সেই অর্থেরই গুমোর অন্যের মুখে! ঠিক এমনি সময়ে? বহুদিন থেকেই প্রীতির চালের কলসের ক্রমাগত ঘায়ে নবতারার ধৈর্যশান ক্ষয়ে ছিল। আজ হ'ল বিস্ফোরণ।

বাংলায় এম. এ, লোকসাহিত্য জানা ছিল। চট করে বলে দিল, "তা, কড়ি দিয়ে কেনার ঝোঁক হওয়া আপনার স্বাভাবিক। যাকে মেয়েরা কড়ি দিয়ে কেনে, তার ওপরেই জোর না থাকলে সারা পৃথিবীটা সেই কড়ি দিয়ে কিনে শোধ তুলতে সাধ যায়। কড়ির মহিমাও তাই সর্বদা প্রচার করতে হয়। আসল বস্তুটি না কিনতে পারলেও নিজের কড়ির ক্ষমতা আছে, এটা তো প্রমাণ করা চাই।"

প্রমথ মুখ ফেরাল। প্রীতি অবাক হয়ে চাইলেন। বন্ধুর বোনের কাছে এমন আঘাত তিনি আশা করেননি। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, চোখের কোণে জলের ছায়া দেখা দিল। স্বামী চরিত্রহীন, কিন্তু প্রতিবেশী এমন করে জানল শেষে? ছোট মেয়ে, তাঁকে এমন অপমান করে বসল অতর্কিতে? অথচ, সেদিনও ভালমন্দ খাবার হ'লে ডেকে তিনি খাইয়েছেন। মেয়েটির স্পর্ধা দেখে হঠাৎ বাক্‌শক্তি লোপ পেল তাঁর। তাছাড়া, একথার উত্তর কি আছে অনাত্মীয় যুবকের সামনে?

থপথপে কাঁপা হাতে জিনিষগুলো গুছিয়ে নিলেন প্রীতি লজ্জায় মাথা নামিয়ে। কোন মতে নিজেকে লুপ্ত করতে পারলে বাঁচেন তিনি। জীবনের গভীর দুঃখের মূলে তাঁর নাড়া পড়েছে। কি নিষ্ঠুর মেয়েটি!

আবহাওয়ার আড়ষ্টতা দূর করতে নবতারা অট্টহাস্য করে উঠল। বুঝুক এবার চালিয়াৎ। সহ্যেরও সীমা আছে! বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

প্রীতি পুলিন্দা হাতে উঠে দাঁড়াতেই আড়মোড়া ভেঙে উঠল প্রমথ, "দিন আমার হাতে, মাসীমা। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।"

"না, না। তা হয় না, তুমি বোস। সামান্য ক'টা জিনিষ। তারার সঙ্গে কথা বলছিলে—"

তারার বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে প্রমথ উত্তর দিল, "কথা শেষ হয়ে গেছে। মেয়েলি ছড়ায় কড়ির অর্থ ঐশ্বর্য নয়—মূল্যহীনতা। যাকে মেয়েরা কেনে, তাকে কিছু দিয়েই কেনা চলে না—তাই—'কড়ি' বলা হয়েছে 'কানা কড়ি' অর্থে। কিনতে জানলে কড়ি লাগে না। কড়ি দিয়ে যে কেনা যায় না, এ জ্ঞান তো আরও দু' একজনের হওয়া দরকার, কি বলেন মাসীমা? চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরব।"

গৌরীর কথা আজ কেবল মনে হচ্ছে। শীঘ্রই একদিন তাকে দেখতে যেতে হ'বে। সেদিন অনেক গল্প করব।

ছেলেবেলার কতকগুলি দিনে গৌরী আমার খুব কাছাকাছি ছিল। তখন বোধ হয় ভাল করে তাকে দেখবার অবকাশ পাইনি। কারণ অতি নৈকট্যে দেখা যায় না। আজ সে সুদূর—উত্তর মেরুর মতই সুদূর। তাই মনে হয় গৌরীকে কত ভালই না বাসতাম!

সেই ভালবাসা আমার শৈশব-মনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া। গুরুজনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যে সব উপন্যাস পড়েছিলাম, তাদের নায়িকাদের বাইরে খুঁজে অন্য পাঠকদের মত আমি হতাশ হইনি। সৌন্দর্যের আদর্শ আমার চোখের সামনেই ধরা ছিল—গৌরী। গৌরীর উপমা আমার কাছে পৌরাণিক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। 'নলোপাখ্যানের' ব্যাখ্যা ক্লাশে শুনে মনে হ'ত দময়ন্তী বোধহয় গৌরীর মতই ছিলেন। সংযুক্তার কথায় ভাবতাম গৌরী যদি সংযুক্তার ভূমিকায় অভিনয় করে তাহ'লে তাকে কত মানাবে। স্কুলের ছোটখাটো নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবশ্যই গৌরী নির্বাচিত হ'ত না। আমি ক্ষুব্ধ হ'তাম আমার হাতে নির্বাচনের ভার নেই বলে।

স্কুলের বন্ধু ছিল আমার গৌরী। এবং এটা যেহেতু বাংলাদেশ সেহেতু বোঝা যাচ্ছে আমরা দু'জনেই মেয়ে। বাংলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে

আজও সহশিক্ষা প্রচলিত হয়নি। 'নলোপাখ্যানম্' পড়ানো হ'ত স্কুলের ম্যাট্রিকুলেশন অথবা সেকেণ্ড ক্লাশে। সুতরাং স্কুলটি অবশ্যই উচ্চ।

রসিকতার প্রচেষ্টা আমি করি না, কারণ আমার সহৃদয় শত্রুবৃন্দ বলেন আমার লেখা মরবিড্। আমার adaptation-এর ট্র্যাজিক থীমের গল্পাদির সমালোচনায় কেউ কেউ বলেছেন বইতে হাস্যরসের অভাব।

এরপর থেকে আমি কেমন নার্ভাস হয়ে গেছি। আমার মনে হয়, হাতীর নৃত্য ঘটবে আমার পরিহাস-উদ্যমে। হাতীর নৃত্য বহন করবার মত ধৈর্যশীলা পৃথিবীও আর নেই। দুই পায়ের ভরেই পায়ের নীচ থেকে আমাদের প্রাচীন পৃথিবী সরে যাচ্ছে।

এত কথা বললাম এই বোঝাতে যে আমি পুরুষ নই। কারণ ভালবাসি বল্লেই স্বতঃসিদ্ধ তথ্য মনে আসে এক পার্টি পুরুষ অপরটি নারী। আমার দুরদৃষ্টে আমি একটি মহাভারতের মত সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেছিলাম। নায়ক নিজের জবানিতে কথা বলছেন। তিনি যে পুরুষ এই কথাটি অতগুলি কথা খরচ করে বলবার আমি আবশ্যকতা অনুভব করিনি। আমার ধারণা ছিল সবাই সেটা বুঝবে। সূর্য উঠলে সে যে চাঁদ নয়, একথা যেমন বক্তব্যের পক্ষে প্রয়োজনাতীত, তেমনি আর কি। ফলে বন্ধুদের অনুযোগ শুনলাম, 'বোঝা যাচ্ছে না ছেলে কি মেয়ে'। তাই এবারে এত সাবধানতা।

গৌরীকে ভালবেসেছিলাম। বহুদিনের বহু দুঃখের সাথী সে, বহু সুখের ভাগীদার। স্কুল থেকে একস্‌কারশনে যেয়ে পথ হারিয়ে গলাগালি ধরে কেঁদেছি গৌরী আর আমি। প্রাইজ পাবার পরে আনন্দে রেড ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধ নৃত্য স্কুলের মাঠে করে বেড়িয়েছি গৌরী আর আমি। সেই গৌরী, সেই আমি! প্রায়ই গৌরীর কথা মনে পড়ে। একবার গৌরীর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন।

গৌরীর বিবাহ হয়ে গেল কলেজের গণ্ডীতে পা দিয়ে। বিবাহে সে আমাকে বা বন্ধুদের কাউকে নেমতন্ন করেনি, অথবা আমিই যেতে পারিনি সে, কথা আজ মনে নেই। মনে আছে শুধু গৌরীকে। তার সঙ্গে আমার সামাজিক জগতের ব্যবহার মনে রাখবার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়।

সুদীর্ঘ দশবছর পরে আজ থেকে তিন বছর আগে হঠাৎ গৌরীর সঙ্গে

মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল। স্কুলের বন্ধুত্বে গভীরতা থাকে, মাধুর্য থাকে, কিন্তু স্থায়িত্ব দেবার কথা মনে জাগে না। কারণ, শৈশব যেমন অজানিতে চলে যায়, আমাদের নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমাদের করবার কিছু থাকে না, তেমনি শৈশবের বন্ধুত্বকেও বেঁধে রাখবার প্রয়োজনকে বড় করে দেখি না। শৈশবকে চলে যেতেই দেখতে অভ্যস্ত আমরা, যতই মধুর হোক না কেন সে। কিন্তু, স্মরণ মনে থাকে। শৈশবের বন্ধুত্বও মনে থাকে। চিঠিপত্র বা যাতায়াতের সেতুবন্ধের আবশ্যকতা কিন্তু দেখি না।

বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। যে বাড়ী বিয়ে, তার পাশের বাড়ীর ছাদে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রতিবেশীদের মধ্যে সদ্ভাব আছে।

ছাদের সিঁড়ির উঠবার মুখে সরু বারান্দা। প্রতিবেশিনী একটি চেয়ারে বসে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে অতিথি অভ্যাগতদের সমারোহ দেখছেন। উদাসীন-ক্লান্তভাব তাঁর ভঙ্গিতে। সিঁড়ি দুইভাগে বিভক্ত। কোনটা ধরব, ইতস্তত করছিলাম। শান্ত-ভদ্রস্বরে প্রতিবেশিনী বলে দিলেন, "ডানদিকের সিঁড়ি।"

এক মিনিট। এগিয়ে যেয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।— "গৌরী, না?"

"তুমি!" আয়তনে ও চেহারায় সম্পূর্ণ পৃথক হলেও দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পারলাম। তারপরে কিছুক্ষণ উচ্ছ্বাস চলল, খবরের আদান-প্রদান।

দেখলাম গৌরীর পরিবর্তিত রূপ। গৌরী আজ শ্যামা। অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা।

আমার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম গৌরীর পেটে আলসার হয়েছে। মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল, সম্প্রতি কিছু কম। করুণভাবে গৌরী বলল, "আশে-পাশের বাড়ীর সবাইকার নেমন্তন্ন, সবাই খাবে। আমি শুধু খাব না। পেটে কিছুই সহ্য হয় না।" মনে পড়ল, শৈশবে গৌরীর লোলুপতা বিখ্যাত ছিল।

অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা ভয়ানক ডাকাডাকি করতে লাগলেন। খাবার পরে আবার কথা হ'বে বলে তেতলার ছাদে উঠে গেলাম।

চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় গলাধঃকরণ করতে করতে অভাবনীয় রূপে গৌরীর

সঙ্গে এই সাক্ষাতের কথা ভাবতে লাগলাম। গৌরী ওল্ড বালীগঞ্জের একটি বিশেষ বড় ঘরেই পড়েছিল। তার সেই বাড়ী কোথায় গেল? এই ভাড়াটে পাড়ায় ছোট ভাড়া-বাড়ী! গৌরীর শ্বশুরালয়ে এক বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ছিল শুনেছিলাম। তারাই বা কোথায়? বাড়ীতে গৌরী, স্বামী ও দুই একটি চাকর-বাকর ছাড়া কাউকে দেখলাম না তো। তবে কি গৌরী আলাদা হয়ে এসেছে? কিন্তু, শুনলাম যে, ওর শ্বশুরও এখানে থাকেন! তবে? এসব রহস্য উন্মোচনের যোগ্য ব্যক্তি কোথায়? কি চেহারা হয়েছে গৌরীর! অসুখটা কি সম্পূর্ণ শারীরিক?

পান চিবোতে চিবোতে গৌরীর শোবার ঘরে এসে বসলাম। অবস্থা খারাপের চিহ্ন মহার্ঘ্য আসবাবে কোথাও নেই। হ'তে পারে আগের সম্পত্তি। কে জানে? গৌরীর চাকর নিম্নস্বরে কি যেন বলল এসে। গৌরী একটু বিপন্ন হয়ে বলল, "আর তো কেউ খাবে না শুধু আমি। তাহ'লে আমার জন্যে দুটো টোষ্ট কর আর একটু স্যুপ্। এই নাও ভাঁড়ারের চাবি।" গৌরী কোমরের রুমাল থেকে চাবি বের করে চাকরকে দিল।

একটু অবাক হ'লাম, এত রাত্রে এমন রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা হয়নি এখনও। কেউ কি নেই? স্বামী তো বাড়ীতেই, তিনিও কি একটু দেখতে পারেন না? তাহ'লে স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই? অথচ জলজ্যান্ত ডবলবিছানা একই খাটে।

গৌরী সাগ্রহে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—যে নির্বোধ প্রশ্ন দশ বছর আগের স্কুলের বন্ধুই শুধু প্রথম—দেখায় পারে—"এত মোটা হয়েছ কেন?—খুব খাও বুঝি? নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কি কি খেলে আজ?"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার গলায় বেধে গেল—একটু আগে গৌরীর নৈশাহারের তালিকা শুনে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। আজ আমি পঞ্চদশী নই, দশ বছর আগে যে পঞ্চদশীর সঙ্গে গৌরীর পরিচয় ছিল।

বেশী কথাবার্তার সুযোগ পাবার পূর্বেই বিয়েবাড়ী থেকে তাগিদ এল— বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে, আমার যাওয়া প্রয়োজন।

পাত্রী বান্ধবী, যেতেই হ'বে। অথচ, গৌরীর সঙ্গে ভাল করে কোন কথাই হ'ল না। গৌরীর বর্তমান জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করা গেল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলাম। বললাম, "আমার বাড়ী তো বেশী

দূরে নয়। তোমার অসুখ দেখে গেলাম। শিগ্‌গিরই একদিন আসব। অনেক গল্প করব।"

গৌরী আমার হাত চেপে ধরল, "শিগ্‌গির এসো ভাই। অনেক কথা আছে। একা একা অসুখ শরীরে এত খারাপ লাগে!"

"নিশ্চয় আসব। সজল নয়নে গৌরী চেয়ে রইল। পাঁচ মিনিট ধরে বিদায় জানিয়ে চিন্তিত চিত্তে আমি চলে এলাম। গৌরীর সম্বন্ধে আমার মনে যে সব প্রশ্ন উঠেছে, সে সব উত্তর এক গৌরীর কাছেই আছে। যেদিন দেখা হ'বে সেদিন জেনে নেব।

বাড়ী ফিরে রাত্রেও বারে বারে গৌরীর কথা মনে হ'ল। আমার আদর্শ সৌন্দর্য সেই গৌরীর রূপ আজ কোথায় গেছে? মাটীর প্রতিমা জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তুললে যেমন তার শ্রী লুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি সর্বরিক্ত হয়েছে গৌরী। অত্যন্ত দুরন্ত, হাসিখুশী মেয়ে কঠিন অসুখে রোগীর জীবন যাপন করছে। না জানি একা একা শুয়ে-বসে থাকতে ওর কত খারাপ লাগে? যে গৌরীর জন্য স্কুলের গাছের কষা কাঁচা কুল মাটীতে ঝরবার অবকাশ পেত না, সেই গৌরী আজ খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত। যেদিন যাব সেদিন সেই ছোটবেলার মতই ওর দুঃখের দুঃখী হ'ব। আমার এখন মাঝে মাঝে যেয়ে ওকে আনন্দ দেওয়া কর্তব্য। সত্যি তো, ওর প্রতি আমার কর্তব্যও আছে।

দুই চারিদিন পরে আমাদের উভয়ের বন্ধু অধ্যাপিকা মনোলীনাকে গৌরীর কথা বল্লাম, "চল ওকে দেখে আসা যাক একসঙ্গে।"

মনোলীনা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, "আহা, সেই গৌরী এমন হয়েছে! যাক একদিন যাওয়া যাবে।"

নানা গোলমালে ব্যস্ত থাকায় তখন-তখন আমার একটি আত্মীয়ার বাড়ীতে নিজের আর যাওয়া হ'ল না। মধ্যে শুনলাম গৌরী ভাল হয়ে গেছে এবং বেড়াতে এসেছে। সেই আত্মীয়া মনোলীনাকে খবর দিয়েছেন। আবার শুনলাম গৌরী অসুস্থ। আমি মনোলীনাকে বলেছিলাম, "চল না, দেখি সত্যিই ভাল হয়ে গেছে কি, না আবার অসুখে পড়েছে। এ সপ্তাহে ফ্রী আছ? শিগ্‌গির যাব বলে কথা দিয়ে এসেছিলাম, এতদিন বাদে একা যেতে কেমন যেন লাগছে।"

মনোলীনা জ্রকুঞ্চিত করে হিসাব করতে করতে জবাব দিল, "এ সপ্তাহে তো আমার অনেকগুলো টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে হ'বে। কবে যে ফ্রী থাকব জানি না। তুমিই যেয়ে ওকে দেখে এস না। আমি কলেজ থেকে ফিরবার পথে যাব একদিন।"

মনে মনে ভাবলাম, গৌরী আবার সে বাড়ী থেকে উঠে যায়নি তো? অবশ্য গৌরীর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে কতদিন আমাদের গাড়ী যায়। নেমে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। বারান্দায় কচিমুখ দু'একটি দেখি বটে। তবে তারা অন্য ভাড়াটে কি গৌরীর সন্তান, জানি না। গৌরীর ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিজ্ঞাসাও করা হয়নি সেদিন তাড়াতাড়িতে। অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করবার আছে! কাছেই থাকে গৌরী। যে কোনদিন গেলেই হ'বে। কিন্তু, যদি সে না থাকে ওখানে? নানা দ্বিধার মধ্যে যেয়ে বোকা হ'ব আমরা। কিছুদিন কাটল। তারপরে আমি কলকাতার বাইরে চলে গেলাম। ঠিক করলাম ফিরে এসেই দেখা করব।

তিন বছর কাটল। যাওয়া হচ্ছে না। কেন জানি না। নানা কাজের চাপ ও অসংখ্য বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত থাকি সর্বদাই। গৌরীকে সব সময় মনে হয়, তার জীর্ণ-শীর্ণ মূর্তি, সজল চোখ এক মুহূর্ত ভুলিনি। চিঠি অবশ্যই লেখা যেত যখন যেতে পারছি না। কিন্তু, বাড়ীটাই চিনি, নাম্বার জানি না। আর, এতদিন বাদে চিঠি লেখাও চলে না। নিজে যেয়ে বুঝিয়ে বলব, কেন এতদিন আসতে পারিনি। সেই গৌরী, সেই আমি! একদিন গৌরীর কাছে যেতেই হ'বে।

আজও আমার গাড়ী গৌরীর বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেল। গৌরীর সঙ্গে কত কথা বলবার আছে। নিশ্চয়ই সময় করে এইবার একদিন দেখা করব।
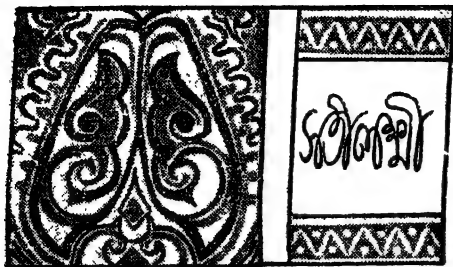
আজ শ্যামশস্পে আস্তৃত বিজন উদ্যান-বাটিকা নয়, সজ্জিত নগরীর আলোকোজ্জ্বল ড্রইং-রুম নয়। গ্রীক সৌন্দর্যে বিহ্বল গাথা আজ তোমাকে শোনাব না। স্বাধীন ভারত, তুমি শুধু আমার সঙ্গে এস, একবার এস। চল, এই সহরের শেষে শহরতলীতে, যেখানে পল্লীর শ্রী নেই, অথচ শহরের শানিত্যও নেই। সেখানে দাঁড়াও, তোমাকে শোনাই এক কাহিনী,—অতি তুচ্ছ, অতি পরিচিত। তুমি আমি মুখোমুখি দাঁড়াই। একটি নিষ্ফল জীবনের কথা শোন।—

স্বামীপুত্র রেখে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে মল্লিকা স্বর্গে চ'লে গেল। ভিড় ক'রে পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল,—"আহা-হাঃ, সতীলক্ষ্মী সিঁথির সিঁদুর হাতের নো নিয়ে গেলেন। আশীর্বাদ কর মা, আমরাও যেন—" সধবারা চোখে অঞ্চল দিল। বিধবারা নিশ্বাস ফেলে কেঁদে উঠল, "ওগো, রাঁড় হবার জ্বালা কি সইবার? মহাপুণ্যি থাকলে এমন যাওয়া যায়!"

অল্পবয়সী মেয়েরা এসে মল্লিকার তুষারশীতল পায়ের ধূলো মাথায় মুছল। বয়স্কারা এক কৌটো সিঁদুর তার চুল-উঠে-যাওয়া চওড়া কপালে ঢালল। কলিকাতার উপকণ্ঠে বাসা ছিল মল্লিকার, শহুরে কেতা সেখানে কম। তাই পাড়ায় পাড়ায় অবাধ আনাগোনা। পাড়ার লোকেরা সকলেই কাঁদছে, এমন মনখোলা মিশুকে মানুষ কি হয়? শরীরটা বারো মাস খারাপ। কিন্তু, মুখে হাসি লেগেই আছে!

দত্তগিন্নী স্থূল অঙ্গে মোটা একখানা বিছানার চাদর জড়িয়ে মল্লিকার শিয়রে শোক করতে বসলেন, "দেখ চেয়ে তোমরা সব, কপাল কাকে বলে! আটটি ছেলে-মেয়ে রেখে, স্বামীকে রেখে কেমন চ'লে গেল!"

মল্লিকার স্বামী স্থরেন চোখের জল মুছে, হাতের কাছে যে সন্তানটি পেল, তাকে বুকে জড়িয়ে, সমবেত জনতাকে উদ্দেশ ক'রে বলল, "এখন আপনারা একে উপযুক্তভাবে শেষ সাজে সাজিয়ে দিন। আমার অবস্থা তো বুঝছেন!—" গলাটা ধ'রে গেল। —"যা করবার আপনারাই করুন।" স্থরেন আবার চোখ মুছে ফেলল।

জনতার মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল, স্ত্রীর শোকে এতবড় পুরুষ মানুষটা করছে কেমন দেখছ! স্বামী কি ভালটাই বাসত!

পতিতাসক্ত স্বামীর স্ত্রী বিন্দু নিজের ভিঁটে-কপালে হাতখানা বুলিয়ে বলল, "যা বল দিদি, স্বামীর সোহাগ না হ'লে আবার স্ত্রী-জন্ম!"

পাড়ার তরুণবৃন্দ দল বেঁধে জুটল শব-সংকারের ব্যবস্থা করতে। বরযাত্রা ও শবযাত্রা দুটোতেই তাদের উৎসাহ সমান। কেউবা দৌড়ো-দৌড়ি ক'রে দ্বিগুণ দামে তারে-গাঁথা ফুলের মালা আর কাঠের গোঁজে শক্ত ক'রে বাঁধা তোড়া এনে ফেলল। অপর পক্ষ খাটিয়া হাজির ক'রে দড়িতে চাপড় দিয়ে দেখতে লাগল জোর খাটিয়াটার। সমস্ত জড়িয়ে মল্লিকাদের বাড়ীর সামনে যেন একটা উৎসাহ-চাঞ্চল্য দেখা দিল, যা শোকের ক্ষেত্রে একান্ত বেমানান।

বেনেদের অন্তঃপুরিকা বউ আজ এই সৎকার-উৎসবে বাইরে আসার হুকুম পেয়েছে। দজ্জাল শাশুড়ী নিজে আদেশ দিয়েছেন, "যাও বউমা, পটলীর মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে এস। অমন সতীলক্ষ্মী সচরাচর দেখা যায় না। পা ছোঁবার সময়ে মনে মনে ব'লো তুমিও যেন এমনই যেতে পার।" অথচ এর আগে এই মল্লিকার বাড়ী দুপুরবেলা বাবুরা অফিসে গেলে একটু বেড়াতে যাবার হুকুম বেনেবউ পায় নি। আজ এই অঘটনে কি জানি কি ভেবে বেনে-বউ নূতন কেনা তিনপেড়ে ডুরেখানাই পরে ফেলল। আড়ালে লাল গামছায় মুখটা বেশ ক'রে মুছে নিয়ে মাথায় কলা-বউয়ের মত ঘোমটা টেনে বাড়ীর বামনীর হেপাজতে বের হ'ল সরু পাড়াগেঁয়ে পথে।

মল্লিকার পুরনো ঝিয়ের এই মাতামাতি ভাল লাগছিল না। শোকটা যে তার নিজের বিলক্ষণ লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই। বহুদিনের পুরনো লোক সে, তায় আবার মল্লিকার বাপের বাড়ির লোক। যেখানে ছত্রিশ বছর বয়সে সোমত্ত ঘরনী-গিন্নী মারা যায়, সেখানে বুক চাপড়ে 'হায় হায়' ক'রে কান্না ছাড়া নিরক্ষরা ঝি আর কিছু জানে না। জলজ্যান্ত সর্বনাশ যে হয়ে গেল চোখের ওপর তার পেছনে সান্ত্বনার ভাষা আছে, বা অকাল-মৃত্যুর শোককে চাপা দেবার মত ধর্ম-কথা হিন্দু নারীর পুঁজিতে জমা থাকে, এ তথ্য মল্লিকার ঝি বোঝে কই? আসলে হিন্দুস্থানী দাই সে, বাংলা মুল্লুকে বাঙালী ঝি ব'নে গেলেও আদর্শটা হিন্দুরমণীর সতীত্ব পর্যন্ত পৌঁছয় নি। সে বুঝল শুধু, মনিব মারা গেছে, আর ফিরে আসবে না। আর শেষবেলায় মাছের ফুলকো-কাঁটা দিয়ে বিনা তেলে চচ্চড়ি বানিয়ে প্রসাদ দেবে না। রান্নাঘরে ধোঁয়ায় রান্না চাপিয়ে মুখ-চোখ লাল ক'রে জীর্ণ কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল গলায়-মাথায় জড়িয়ে ঝিয়ের সঙ্গে চাপা সুরে শ্বশুরবাড়ির কুৎসা বা নিজের দুঃখ গাইবে না। কোলের ছেলেটাকে দুধ দিতে দিতে ঝিয়ের কোলে ফেলে রাস্তার ফেরিওয়ালার কাছে দর-কষাকষি ক'রে স্বামীর রুমালের জন্যে এক গজ রঙিন কাপড় কিনতে সে আর ছুটবে না। যে গেল, সব সুখ-আহ্লাদ শিকেয় তুলেই সে গেল।

ঝি তাই অপ্রসন্ন কান্না-জড়ানো গলায় সমবেত জনতার মধ্যে বলে উঠল, "মাজীর আমার মরবার ইচ্ছে ছিল না। কি দুঃখেই মা আমার গেল!"

দত্ত-গিন্নী বেতালা কথা শুনে ভুরু কুঁচকে রুখে এলেন, "তুই বাছা চুপ কর্। যা-তা ঠাস ঠাস বলিস নে। বিধবা বোস-গিন্নী দাঁত খোঁটাতে খোঁটাতে বললেন, "খোট্টাই ভূত, ওর আবার একটা কথা! বলি, এমন যাওয়া কে না যেতে চায়? আমাদের মত পোড়াকপাল নিয়ে বেঁচে থাকা আবার থাকা! হরি যে কবে চরণে ঠাঁই দেবেন!" বোস-গিন্নী শিবনেত্র হয়ে ফোঁস ক'রে সাপের মত নিশ্বাস ফেললেন; যেন পার্থিব জগতে তিনি বেঁচে আছেন—এটা মস্ত বড় অপরাধ বিধাতার; এতে তাঁর কোন হাত বা বাসনা নেই। কিন্তু, আমি জানি, বাড়ি ফিরেই তিনি বধূকে তিরস্কার করবেন তাঁর ইসবগুল গোলমালে ভেজানো হয়নি ব'লে; কবিরাজী বড়ি নিপুণভাবে খলে মেড়ে

চেটে চেটে খাবেন ; তাগিদ দেবেন ছেলেকে ঔষধ বদলি ক'রে আনতে। অম্বল চাগিয়ে উঠেছে কি না!

ঝি বেচারী সেন্সরে কর্তিত হয়ে চুপ করল। গজগজ করতে করতে সে মল্লিকার দু'মাসের ছেলেটাকে অয়েল-ক্লথ থেকে কোলে তুলে নিয়ে মুখে চুষি চেপে ধরল। নেংটি ইঁদুরের মত কালো, হাড়-জিরজিরে ছেলেটা, অথচ ওরই জন্ম-পরাক্রমে ওর মায়ের অসময়ে আজ এ দশা।

পাড়ার মেয়েরা এরই মধ্যে মল্লিকার ছোট্ট বড়ি-খোঁপাটা খুলে বিবর্ণ রুক্ষ চুলগুলো তেলে চকচকে করে তুলেছে। নিরুপমার তোলা গন্ধ-তেলের শিশিটা আজ নিরুপমার সখী মল্লিকার মৃত্যুবাসরে কাজে লেগে গেল। এই রকম এক শিশি ঠাণ্ডা গন্ধ-তেল কিনে মল্লিকা মাখবে ভেবেছিল অনেকদিন, কিন্তু সংসারের টানাটানির মধ্যে হয়ে ওঠে নি। মল্লিকার বিয়ের তোরঙ্গ খুলে পড়শীরা খুঁজতে লাগল, কোন্ শাড়িখানা এ ক্ষেত্রে গৌরব রাখতে পারে। সামান্য মিলের কাপড়খানি পর্যন্ত সযত্নে ভাঁজ ক'রে মল্লিকা রেখে দিয়েছে। সুতী সেমিজগুলো সে ধুইয়ে তুলে রেখেছিল। ভাল কাপড় ক'খানি শুকনো লঙ্কা আর ন্যাপ্থলি ভাঁজে ভাঁজে দিয়ে রাখা। একটি জামা পর্যন্ত প্রাণে ধ'রে পরে নি। সারাটা দিন খালি গায়ে আধময়লা কাপড় জড়িয়ে ছেলে-মেয়ের সেবা, সংসারের রান্না এই ছিল তার অভ্যাস। গেরো দিয়ে ছেঁড়া শাড়ি পর্যন্ত পরেছে মল্লিকা, যখন বাক্সে আস্ত কাপড়ের অভাব নেই। এ বিষয়ে কেউ মন্তব্য করলে উত্তর দিত, "সমস্ত কাপড়-চোপড় কি একসঙ্গে প'রে নষ্ট ক'রে ফেলব? রেখে দিচ্ছি, যখন দরকার পরলেই হ'বে।"

কৃপণের মন মল্লিকার। শৌখিন দ্রব্য ব্যবহার না করলেও লোভ ছিল প্রচুর। বড়লোক বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া ভাল কাপড়-জামা সে একদিন, দু'দিন ছাড়া পরে নি। চাবি দিয়ে বিয়ের তোরঙ্গে সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। এসব সঞ্চয় তার কাজে লাগবে না।

একখানা জরির বুটিদার ঢাকাই তুলে নিরুপমা বলল, "এখানা মল্লির খুব পছন্দের ছিল। এখানাই পরিয়ে দেওয়া যাক।"

পাশে ব'সে ঝি এতক্ষণ ক্রুদ্ধভাবে মল্লিকার সযত্নে সাজানো বাক্স

হাটকানো দেখে মনে মনে ফুলছিল। এখন সে ফোঁস ক'রে উঠল, "না গো, ওটি মাইজী ছেলের বউয়ের জন্যে রেখেছেন।"

"কি ঘেন্না, মা! মাগীর আক্কেল দেখ! বলে—লোকটাই গেল, তার আবার একখানা সুতোর কানি!" বোস-গিন্নী গালে হাত দিলেন।

মল্লিকার দূর-সম্পর্কের ভাশুরঝি কলেজে পড়ুয়া জ্ঞানদা এসেছিল কাকীমার শবযাত্রা দেখতে। চশমা-বদ্ধ নয়ন তার ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'ল পারমার্থিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক কথাটা শুনে, সাধে কি এদের ছোটলোক বলে?

ফের ধমক খেয়ে ঝি মুখভার ক'রে এক কোণে পা ছড়িয়ে ব'সে ছোট খোকাকে নাচাতে লাগল। যে যাই বলুক, তার মাইজীর মনের কথা সে যেমন ক'রে জানে, তেমন ক'রে কেউ জানে না। কতদিন ওই শাড়িখানা রোদে দিয়ে সযত্নে তুলতে তুলতে মল্লিকা ওকে বলেছে, "জানিস রাধা, এই শাড়ীখানা আমার পঙ্কজের বউ এলে তাকেই পরাব। হিমু পেটে মা আমাকে সাধ দিয়েছে, তা আমার ছাই কালো রঙে ফিরোজা রং মানায় না। বউ আনব টুকটুকে দেখে।"

টুকটুকে বউ আনবে, সে চলল আজ কেওড়াতলার শ্মশানে। এমন কি, যে কাপড়খানা সে বউকে পরিয়ে দেখবে, সে কাপড়খানাও ছাই হয়ে যাবে কুলকাঠের আগুনে। রাধা-ঝির মনের মধ্যে যেন কষকষ ক'রে উঠল। সাধের জিনিসের এমন অপচয়!

বারান্দায় সুরেন মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ছিল। শ্বশুর-শাশুড়ী দিল্লীর বাসিন্দা। ষোল বছরের মেয়েকে বিশ বছর আগে বাংলা দেশে বাইশ বছরের পাত্রের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। যৌতুকপত্রের সঙ্গে এসেছিল ঝি। ঝিয়েরও বয়স ছিল অল্প, পুরনো ঝিয়ের বিধবা মেয়ে। দিদিমণির শ্বশুর বাড়ীতে এসে দিদিমণিকে গোড়া থেকেই 'মা' ব'লে ডাকত, কখনও 'মাইজী' বলত। বাংলাই হয়েছিল দেশ ওর, বেহারীত্ব ঘুচে গিয়েছিল! মাইজীর ছায়া হয়ে সে তার অস্তিত্ব দিয়েছিল লুপ্ত ক'রে।

একাদশ সন্তানের জন্মের পরে মল্লিকা যথারীতি রোগশয্যায় পড়লে সুরেন যথারীতি প্রবাসী শ্বশুর-শাশুড়ীকে খবর দিয়েছিল। প্রত্যহ চিঠি লিখে এবং

দু-একখানা তার ক'রে খবর নিলেও মা-বাবা ব্যস্ত হন নি খুব বেশি। কারণ প্রত্যেক সন্তান জন্ম দেবার পরই মল্লিকার এই দশা হয়। কিন্তু সে আবার সেরে ওঠে, আবার সংসারের চাকা হাতে ঘোরায়। দু-একবার তাঁরা ছোটা-ছুটি ক'রে এসেছিলেনও। এখন এ বয়সে আর অত দূর থেকে ছোটাছুটি পোষায় না। তা ছাড়া পুত্রদের সংসার ও নাতি-নাতনী নিয়ে তাঁরা যথেষ্ট বিব্রত। তাই মল্লিকার শেষ-সময়ে পিতৃকুল এসে পৌঁছুতে পারেন নি। বাঙালী-ঘরে ছেলে হওয়া এমন লাট-বেলাটের ব্যাপারও তো নয়। দোষ দেওয়া চলে না।

মল্লিকার শ্বশুরকুল থাকেন গণ্ডগ্রামে। বউ যে ছেলের চাকুরিস্থলে আজ আট বছর এসে পৃথক সংসার পেতেছে, এতে শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রবধুর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। বরঞ্চ দু'মাসের ভারী রুগীর ওষুধপথ্যে মোটা টাকা বেরিয়ে যাবার জন্য বিশেষ বিরক্ত হচ্ছিলেন। তবু কর্তব্য বিবেচনা ক'রে তাঁরা বিধবা মেয়েকে ভাইয়ের সংসার দেখবার উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। সে এতক্ষণ কেঁদে ককিয়ে গলা ভেঙে এলোচুলে গিঁঠ দিয়ে উঠল দাদার কাপড় গামছা গুছিয়ে দিতে।

পাশের ঘরে মল্লিকার বৃদ্ধা পিসীমা। ভাইঝির অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলেন কয়েক দিনের মেয়াদে। বুড়ী নিশ্চল হয়ে এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছেন। কাঁদছেন কি ঘুমোচ্ছেন কে জানে?

নাঃ, সংসারটা ছারখারে গেল। সে তো সতীলক্ষ্মী, গেল সব রেখে, এখন তার সংসার আমি একা বজায় রাখতে পারলে হয়! গেরস্থ-বাড়ি কি গিন্নী ছাড়া চলে?—সুরেন ভাবছে, ভাগ্যিস, পাড়াপড়শীরা লোক ভাল। নইলে, এই তো শীতের বেলা, সন্ধ্যে নেমে আসছে, পথও কম নয়। শহর থেকে এতদূরে বাসা নেবার শাস্তি এখন ভোগ। বড় ছেলেটার সর্দি যত হয়েছে, ঠাণ্ডা না লাগে! সতী সে, ছেলের হাতের আগুনটা তো মুখে দিতে হ'বে।

সুরেন হতভম্ব হয়ে গেছে। প্রত্যেকবারই তো এই রকম হয়, আবার তো সে সেরে উঠত। এগারোটির মধ্যে তিনটি গেছে। স্বামীর মুখ চেয়ে তাতেও সে বিচলিত হয় নি। বারে বারে মর-মর হয়ে নিয়মিত সেরে

উঠত। আবার অফিস থেকে ফেরার পরে হাতে গরম পরোটার রেকাবি নিয়ে শীর্ণমুখে হাসি টেনে কাছে এসে দাঁড়াত। তার এত যত্নে সাজানো সংসার! পুরনো কাপড় দিয়ে কেনা ঘটি-বাটি, কাপড়ের পাড় জুড়ে সেলাই করা বিছানার ঢাকনা, ব্র্যাকেটের বুকে বিলিতী মাটির লক্ষ্মী-প্রতিমা—সব প'ড়ে রইল, সে-ই চ'লে গেল! সে আর ফিরে আসবে না। হোলির দিনে আবীর স্বামীর পায়ে রেখে সধবা মরবার আশীর্বাদ চাইবে না। মাথা ধরলে হাড়-বার-করা আঙুলগুলি দিয়ে চুলে পাক দিয়ে দেবে না। দিনান্তে রাত্রির গভীরতার মধ্যে সে আর ফিরে আসবে না স্বামীর বাহু-বন্ধনে। দু'শো টাকার কেরানীর স্ত্রী যে একাধারে পাচিকা, পরিচারিকা, সেবিকা এবং প্রেয়সী!

এতগুলি দাবি মেটাতে হ'লে, এতগুলি সন্তানকে জন্ম দিতে গেলে শরীরের যা প্রয়োজন, তা মল্লিকার মিটত কি না—এ সংবাদ স্বরেন অবশ্যই রাখত না। কিন্তু ঝি জানে। কতদিন রাধার সামনে নিজের ভাগের মাছখানা স্বামীর পাতে তুলে দিয়ে অরুচির দোহাই দেখিয়ে মল্লিকা শুধু গুড়-তেঁতুল গুলে এক থালা ভাত খেয়ে নিয়েছে। সাধে কি সতীলক্ষ্মী বলা চলে? চোখের যন্ত্রণা অবহেলা ক'রে স্তিমিত লণ্ঠনের আলোয় উলের সোয়েটার বুনে বুনে ছেলে-পিলের শীতনিবারণের ব্যবস্থা সস্তায় সেরেছে। ঘরদোর ছিল মল্লিকার সাজানো গোছানো, রান্নার হাত নিপুণ। কলের চাকা তো আপনি চলত, তেলের খবর তো কেউ রাখে নি!

আজ মরেছে মল্লিকা সিঁথের সিঁদুর নিয়ে। লোকের মধ্যেও সবাই ধন্য ধন্য করছে, পায়ের ধুলো নিচ্ছে। যেন এ মৃত্যু শুধু মৃত্যু নয়, মহাকৃতিত্ব। সর্বনাশ ঘটল চোখের সামনে, তবু অন্তরালে কোথাও সান্ত্বনা খুঁজে বা'র করেছে সবাই। স্বামীপুত্র রেখে সুখের সময়ে স'রে যাওয়া, শোকতাপ বিশেষ না পেয়ে—এর চেয়ে প্রিয়তর কি থাকতে পারে হিন্দু রমণীর? আহা, যুগে যুগে গঙ্গার পাড়ে, মন্দিরের-ধারে মাথা কুটে তো ওই একই কামনা একনিষ্ঠ-ভাবে। প্রিয়-বিয়োগ হিসাবে যদি দুঃখ ধরা যেত, তা হ'লে এ কামনা তো পুরুষও করতে পারত। কই, পত্নীকে রেখে যাবার প্রার্থনায় মাথা কোটাকুটি কাকেও তো করতে দেখি নি! স্ত্রী মারা গেলে সহানুভূতি এসেছে, কিন্তু

অবহেলা, অনুকম্পা আসে নি—যেমন সদ্য-বিধবার উপরে হয়। ভাগ্যি, ভগবান বাংলার মেয়েকে সর্বংসহা ক'রে গড়েছিলেন। তার অস্থিমজ্জায় লিখে দিয়েছিলেন: স্বামীকে রেখে তুমি ধরাধাম ত্যাগ কর। নইলে কপালে বিস্তর দুঃখ আছে। তাই মল্লিকার অকাল-মৃত্যুতে আমরা সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি। সকলে মিলে সতীলোকে তাকে উন্নীত ক'রে দিয়ে তার জীবনের বিফলতাকে মধুর প্রলেপে আবরিত ক'রে রাখছি।

কিন্তু ওই ঝি রাধা জানে, সতীলক্ষ্মীর এত তাড়াতাড়ি সধবা মরবার ইচ্ছা ছিল না। সতীলক্ষ্মীর মনে যতটা আঘাত লেগেছে মৃত্যু আসন্ন আভাসে বুঝে, ততটা—এ পাপ-মনে অনুমান করছি—হয়তো পতি-বিয়োগেও হ'ত না। জীবনের অবলম্বন তো এক নয়, পুত্রকন্যাকে সংসারে বেঁধে তার সাধ মিটত হয়তো। তবু স্বামীর আগে যাচ্ছি মনে ক'রে হিন্দুনারী একটা অসহায় সমর্পণের সুরে মনের ভার বেঁধে নেয়। অনন্যোপায় পুরুষের ব্রহ্মচর্যের মত।

রাধা জানে, এবারে পুত্রমুখ-সন্দর্শনের ইঙ্গিতে মল্লিকা পুলকিত হয়ে ওঠে নি, হয়েছিল ভীত।

"জানিস রাধা, এবারে যেন শরীরটা কেমন কেমন লাগছে। গায়ে যেন জোর পাচ্ছি নে। ভালয় ভালয় হয়ে গেলে, বড়দার কাছে ডেরাডুনে একটু হাওয়া বদলে আসব। এত ক'রে ভগবানকে ডাকলাম, দশটি তো দিয়েছ, আর কেন? তিনটি তো গেছেই! ডাক্তার বারণ ক'রে দিয়েছিল মেনার জন্মের পরে। আবার তো হ'ল।"

কিন্তু কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত স্বামীর দাবি সে মিটিয়েছিল নিরুত্তরে। স্বামীর ভালবাসা পেয়েছে, সে ভালবাসায় প্রাণ থাক্ আর যাক। তা ছাড়া, সতীর নাকি স্বামীর মতেই মত।

রাধা জানে, মল্লিকা নিজের মাপে পুরো হাতা গরম জামা বুনতে শুরু করেছিল। অনেক দিনের শখ। জামা শেষ না ক'রে, গায়ে না প'রে যে মল্লিকার দেহত্যাগের ইচ্ছা হ'তে পারে, রাধা তো তা বিশ্বাস করতে পারে না। কই, কোন সান্ত্বনা সে তো খুঁজে পায় না!

এরই মধ্যে মল্লিকার শির-ওঠা কালো কালো পায়ে টকটকে লাল আলতার ছোপ দেওয়া হয়েছে; টাকের মত চওড়া সিঁথিতে সিঁদুর লেপে লেপে

বীভৎস ক'রে দিয়েছে। অসুখে ভুগে বড় বড় দাঁতগুলো ওর বেরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা মুগ্ধ শ্রদ্ধায় বলাবলি করতে লাগল, সতীলক্ষ্মী হাসছে দেখ!

তিনপেড়ে ডুরে পরা বেনে-বউ শাশুড়ীর নির্দেশমত মল্লিকার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়েছিল বটে, কিন্তু শাশুড়ীর শেখানো কথা কিছুতেই ওর মুখে আসে নি। ও মরতে চায় না। বয়েস কম, পৃথিবীটা ভালই লাগে। ওরে বাবা, কত সাধ বাকি! একগা গয়না ওর, আশা মিটিয়ে পরা হয় নি, প্রাণ ভ'রে টকি দেখার শখ মেটে নি। না, ওর রাতারাতি একেবারে সতী নাম কিনে জনতার সমাবেশে রাণীর মত খাটিয়া-তাঞ্জামে চ'ড়ে সতীলোকে যাত্রার অভিলাষ নেই।

মল্লিকা হাসছে কি না দেখতে তার মুখের দিকে চেয়ে বেনে-বউয়ের বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল। মল্লিকার সারা মুখে যেন হতাশা, অতৃপ্তি আর যন্ত্রণা মাখানো। দাঁত সে বের করে আছে ঠিক, কিন্তু হাসছে না, বিধাতাকে যেন ভেংচাচ্ছে, যে বিধাতা লোকচক্ষে তাকে এত বড় মৃত্যুর সম্মান ও সতীত্বের গৌরব দিয়েছেন।

মল্লিকার ছড়ানো দাঁতের পাটির দিকে তাকিয়ে বেনে-বউয়ের যেন ভয় করতে লাগল। ও তাড়াতাড়ি স'রে এসে ঘোমটা আঙুলে ফাঁক ক'রে ধ'রে ওদের বামনীকে খুঁজতে লাগল বাড়ি ফিরবে ব'লে।

ছেলের দল দড়াদড়ি নিয়ে প্রস্তুত। ফুলের মালাগুলো খাটিয়ার শিয়রে রেখে সুরেনের খুড়তুতো ভাই তাপস বলল, "বউদির শরীরে কিছুই ছিল না। শ্মশান দূরে হ'লেও যেতে কষ্ট হবে না।"

ছেলেমেয়েগুলোকে সরিয়ে অন্য বাড়ীতে নেওয়া হ'ল। মেয়ের দল পুরুষদের পথ ছেড়ে দিয়ে আঁচলে ঘন ঘন চোখ-নাক মুছতে লাগল। মল্লিকার ননদ দাদার হাতে ঘাটের কাপড়-গামছা তুলে দিয়ে আবার আছড়ে পড়ল।

"ওগো বউদি, কোথায় গেলে গো! সাজানো সংসার ফেলে। ছেলে-পিলে অনাথ ক'রে, সতীলক্ষ্মী কোথায় গেলে গো!"

অবশ্য বউদি কোথায় গেছে, সে বিষয়ে তার তিলমাত্র অস্পষ্ট ধারণা ছিল না, ও অবচেতন মনে দ্বিতীয় বউদির গোলাপী চিত্রখানা ঈষৎ দ্বিধায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল।

বোস-গিন্নী খনখন ক'রে ঝিকে ধমক দিলেন, "স'রে বস্ মাগী, শুদ্দুর হয়ে বামুহনের মড়া ছুঁসনি। ও রামু, ঘাট ফেরতাদের নিমপাতা, মটর রাখছ তো? ফিরে এলে যে দাঁতে কাটতে হবে।"

হরিবোল দিয়ে মল্লিকাকে খাটে তোলা হল। মুখে মাছি পড়ছিল, আঠারো বছরের বড় ছেলে পঙ্কজ তাড়াতে গিয়ে বেকায়দায় একটা চড় মেরেই বসল। অবশ্য তখনই পায়ের ধূলো নিলে সে সবিনয়ে।

এ দিকে রাধার মল্লিকার শোকে ও ক্রমাগত গালমন্দ শুনে শুনে মাথার ঠিক ছিল না। কোলের ছেলেটার দিকে চেয়ে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। এই রাক্ষসই তো মাকে খেল। অসহায় শিশুর গালে সে ধাঁ করে একটা চড় মেরে বসল। রুগ্ন ছেলেটা ককিয়ে উঠল। বোস-গিন্নী আবার ধেয়ে এলেন, "ইতর মাগীর কাণ্ডটা দেখ, দিদি। মা মরল সদ্য সদ্য, হতচ্ছাড়ী এল ছেলে শাসন করতে। আয় বাবা, আমার কোলে আয়।" "ছেলেটাকে নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি। ঝি তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকে চেপে ঘরে চ'লে গেল। মল্লিকার শূন্য বিছানাটার কাছে মাটিতে ব'সে পড়ল। কর্কশ হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে, এমন সর্বনাশ কেমন ক'রে পৃথিবী নিত্য নতমস্তকে সহ্য করছে, কেমন ক'রে এমন অবিচার জগৎ মেনে নিচ্ছে, ভেবে অবাক হয়ে গেল। অশিক্ষিত মন, দর্শনের ধার ধারে না। চোখে যা দেখছে, সে-ই তার সত্য।

দত্ত-গিন্নী মোটা ভারী গলায় উত্তর দিলেন, "সুরেন ফিরে এলে ঝেঁটিয়ে আপদ বিদেয় ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও। এখন তো আমাদেরই সব দেখাশোনা করতে হবে। ওর তো মুক্তি হয়ে গেল, বাঁচল। সুকৃতির ফল ছিল পূর্বজন্মের। কিন্তু এগুলোকে দেখাশোনার দায়ে রেখে গেল। ওই খোট্টাই ভূত দিয়ে তো চলবে না! রকম-সকম দেখ না! আ মর, 'সকলে গেছে ম'রে, কত্তা হ'ল হরে'!"

তাপস পথে নেমে যেতে যেতে বলল, "সত্যি দাদা, ঝিটাকে এসেই বিদেয় করে দেবেন। ছোটলোকের মন বলেও কি জিনিস নেই? এত ভালবাসতেন বউদি ওকে। তাঁকে ভাল ক'রে বারও করা হয় নি, এখনই ও ছেলেটাকে মেরে বসল!"

সুরেন উত্তর দিল না, কারণ তখন সে মনে মনে শ্রাদ্ধের ব্যয়ের খসড়া করছিল। চন্দনধেনু এ ক্ষেত্রে করণীয়, কিন্তু টাকা মিলবে কোথায়? না করলেও মনটা খুঁতখুঁত করবে, লোকে ছি-ছি করবে। ব্যাঙ্কে তো একটি পয়সাও নেই, এত বড় ব্যয়টা ঘাড়ে এসে পড়ল। এখন কি যে হবে?

সতীলক্ষ্মী চারজনের কাঁধে চড়ে স্বর্গযাত্রা করলেন। এমন তো নিত্যই হচ্ছে, সুতরাং আমরা এতে বিচলিত হ'ব না।

শ্রীমতী আবার পিত্রালয়ে এসেছে। স্বামীর ভ্রাম্যমান কাজে শান্তি নেই একদণ্ড। হয়তো আজ লাহোর, কাল পাঞ্জাব ট্যুরে যেতে হ'বে। বিবাহের পর-পর শ্রীমতী সঙ্গে সখ করে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনযাত্রা এতই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে তার চেয়ে এই বিরহ ভাল। চুপচাপ শয্যায় শুয়ে দিবাস্বপ্ন। আতঙ্ক নেই। স্বামী আছেন। প্রত্যেক ডাকে চিঠি, মাঝে মাঝে তার আসছে। যথাসময়ে ফিরে আসবেন তিনি। শ্রীমতী নিজের গৃহে যাবে। কয়েকমাস নিরুপদ্রব দিনযাত্রা চলবে। আবার হয়তো ডাক আসবে। স্বামী বিমনা মনে চলে যাবেন কলকাতার বাইরে। শ্রীমতী কলকাতায়ই পিত্রালয়ে থাকবে।

বন্ধুরা বলে, "সঙ্গে সঙ্গে তুমি যাওনা কেন, শ্রীমতী? ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট নেই। একা মানুষ, কত জায়গা দেখতে পার। তাছাড়া অমুকবাবু একা একা ঘোরেন। সেটা কি ভাল?"

শ্রীমতীর সুন্দর চোখ দুটিতে বিষাদ ছায়া ফেলে। চুপ করে থাকে সে। মা একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "শ্রীমতীর লিভারটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। অনিয়ম তো ওর সহ্য হয় না।"

ডাক্তারবাবু দেখতে আসেন। নীল-ঢাকা বিছানায় শুয়ে থাকে বিরহিনী। একখানা হাত ঝুলে আছে, যেন কমনীয় কঙ্কনপরা মণিবন্ধ ভার বহন করতে পারছে না। যদিও অনামিকার চুনীর আংটিটি একটুও ঢিলে হয়নি।

যদিও অনামিকার চুনীর আংটিটি একটুও ঢিলে হয়নি তবু ঔষধের প্রেসক্রিপসন লেখা হয়। মিষ্টি সুস্বাদু ঔষধ। শক্ত-সমর্থ ডাক্তারবাবু লোভী দৃষ্টিতে অবসন্ন তন্বীদেহের দিকে চান। রুক্ষ গলা মোলায়েম করবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করেন, "আপনার স্বামী এখানে নেই?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর হয়, "না, তিনি ট্যুরে গেছেন।"

ডাক্তারবাবু মনে মনে নিশ্বাস ফেলেন। মনে মনে হা-হুতাশ করে গাড়িতে ওঠেন।

কেটে যায় বিরহিণী শ্রীমতীর দিন।

দিন কাটেনা আর। পাশের বাড়ীর তরুণ স্তাবক জর্জি বিদেশে চলে গেছে। কাজ নেই, কর্ম নেই। শ্রীমতীর মন উড়ু-উড়ু করে, হু-হু করে। তবু ভাবতে পারে না স্বামীর সঙ্গিনী হ'বার কথা। পাহাড়ে পথে হাঁটা, অস্নাত থাকা। রং পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কোমল মুখচোখ কঠোর হয়ে ওঠে। ত্রিশ বৎসর বয়সেও যে পেলব লাবণ্য শ্রীমতীর বিশেষত্ব, কোথায় চলে যায় সে লাবণ্য। তাছাড়া, নিত্য রজনী পুরুষের ভোগ্য হওয়া সত্যই পোষায় না। বয়স হয়ে যাচ্ছে, এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। বন্ধ্যাত্ব শ্রীমতীর বর। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। কোনরূপ চিকিৎসা সে করতে চায় না। চায় না রাতারাতি জননীত্ব লাভ করে ধন্য হ'তে।

ভ্রাতৃবধূদের দেখে গা শিরশির করে ওঠে তার। বুক ঢুকে গেছে পিঠে, ঢিলে হয়েছে পেশীর বন্ধন। ছিমছাম পোষাক রাখা যায় না। ছোট শিশুদের লালন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে হয়।

চব্বিশবছরে বিবাহ হয়েছে শ্রীমতীর। কন্যার শালীন বিলাসিতা দেখে মাতাপিতা চিন্তিত হ'তেন। ভাগ্যক্রমে জামাতা হয়েছে মনোমত। একমাত্র কন্যা, অতি আদরের। বিবাহিতা হ'লেও মাঝে মাঝে রাখা যায় কাছে। জামাতা ব্যবহার করেন স্ত্রী যেন মহামূল্য কাঁচের পুতুল। কুমারী জীবনের রুচি নিঃসন্দেহে রক্ষা করতে পেরেছে শ্রীমতী।

তবু ক্লান্তি লাগে। নীল বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভাবছে শ্রীমতী। বিবাহটাই সহ্য করা কঠিন তার পক্ষে, বড় কঠিন। সারা জীবন কৌমার্য

মোহের পরিমণ্ডল রচনা করে যদি সে থাকতে পারত! যদি সন্ধ্যার সময়ে পুরুষালি ভিড় ও স্তবগুঞ্জন সহ্য করে, মাঝে মাঝে দেহের সীমানায় নেমে এসে উর্ধের মানসী হয়ে থাকতে পারত সে! কেন এমন ভুল করে ফেলল হঠাৎ?

বড়লোকের ছেলে, সচ্চরিত্র, বড় চাকুরে, বিদ্বান। এইটুকু মাত্র দেখে নিয়েছিল। অসার্থক প্রণয় একটা ঘটেছিল তখন শ্রীমতীর জীবনে—অখিল বসু। মরীয়া হয়ে মা-বাবার মতে মত দিয়ে মরছে এখন শ্রীমতী।

তবু রক্ষা এই ছুটীটুকু আছে বিবাহিত জীবন থেকে। Wife's Holiday! স্বামীর মুখ চেয়ে এটুকু বর্জন করলে বাঁচা যায় না। বন্ধুরা যা বলে বলুক, মাঠে ঘাটে এত বয়সে ঘোরা শ্রীমতীর পোষাবে না। ভালই হয়েছে, স্বামীর ভ্রাম্যমান কাজ হয়ে। দেহ ও মনের এমন অবকাশ মিলবার সুযোগ থাকত না।

পার্ল বাক্ 'Pavilion of women' বইতে চরম সত্য কথা লিখে গেছেন—চল্লিশ বছরের নায়িকা স্বামীর কাছ থেকে ছুটী চাইছেন পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করে। অবশ্য স্বামীর জন্য বেশ সহৃদয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন একটি রক্ষিতা নিজে সংগ্রহ করে দিয়ে। শুধু তাই নয়, স্বামীর মনোমত রূপে গড়ে দিয়েছিলেন ওকে।

এই অদ্ভুত নায়িকার মর্মবাণী কি? নির্লিপ্ততা বা উদারতা কোনটাই নয়, প্রেমহীনতা। প্রেমের বেদ কামনা। প্রেম-করা নির্লিপ্ত দেহমনে অসহ্য লাগে।

স্বামীকে সত্যই ভালবাসতে পারিনি—শ্রীমতী ভাবছে। বিনা প্রস্তুতিতে নরনারীর সম্পর্ক স্থাপনা। তারপরে, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য। কারণ আকাশের রামধনু যে প্রেম, সেতো ফুটবার আগেই আমরা চাই মেঘ, চাই বর্ষন।

যারা এসেছিল জীবনে তার, পাখীর মত লঘু ডানায় আকাশ ছেয়েছিল; আজ তারা নেই। তবু আসে মাঝে মাঝে কোথা থেকে উড়ে বিদেশী পাখী? গানে গানে ভরে যায় দিন শ্রীমতীর।

মনের এ হেন অবস্থায় দেখা হল পাশের বাড়ীর বিবাহিতা কন্যা মনোরমার

সঙ্গে। বিবাহ করেছে সে মনোনীতকে, বাড়ীর মত অগ্রাহ্য করে। কাছা-কাছি তার শ্বশুরবাড়ী। কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসে।

শ্রীমতীর একজন নারী-ভক্ত মনোরমা। শ্রীমতীদির সব কিছুই ভাল মত পোষণ যারা করে, তাদের এক জন মনোরমা। অবশ্য শ্রীমতীর কৃপাদৃষ্টি কোন-দিনই তার ওপরে পড়েনি।

একটি দু'টি সন্তান হয়েছে মনোরমার। স্বাস্থ্যটি গেছে, হয়তো বা জন্মের মত। গৃহস্থ বাড়ীতে ঘরের বৌ-এর বিশেষ যত্ন সম্ভবপর নয়। অথচ সম্পন্ন পিতৃগৃহে বিশেষভাবেই মনোরমা মানুষ হয়েছে। একদিন আদর ছিল তার, আজ শ্বশুরালয়ে হয়েছে হতাদর।

পাতলা চেহারা মনোরমার। প্রাক-বিবাহযুগে ছিল তন্বী, এখন হয়েছে হ্যাংলা। বড় বড় চোখের দৃষ্টি ধৈর্যে করুণ। স্বাস্থ্যহীন দেহে ঠোঁট দু'খানি চোখে লাগে স্ফীত ও আরক্ত বলে। গান গায় সময় পেলে, বিয়ের আগে গাইয়ে মেয়ে ছিল।

এই মেয়েটি কিছুদিন যাবৎ শ্রীমতীকে ক্রমাগত তোয়াজ করছে একদিন তার বাড়ী নিয়ে যাবে বলে। এ বাড়ীতে তো শ্রীমতীর গতায়াত মনোরমার পিত্রালয়ে আছে। মনোরমা চায় শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে যেতে শ্রীমতীকে। গর্ব করে দেখাতে ননদকে, জাকে, এমন সুন্দরী, এমন মহিয়সী শ্রীমতী মৈত্র ভালবাসেন মনোরমাকে। পিত্রালয়ের আভিজাত্য যেমন বধূদের গৌরবের বস্তু, তেমনি গর্বের বস্তু অভিজাত বন্ধু। ফলে, মনোরমার পীড়াপীড়িতে অধীর হয়ে উঠল শ্রীমতী।

প্রথম মনোরমার সঙ্গে দেখার দিন মনে পড়ে গেল। সদ্য বিবাহ হয়েছে শ্রীমতীর। সর্বভারতীয় সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কয়েক মাস আগে স্বর্ণপদক পেয়েছে ও। পাড়ার মেয়েদের একটি ক্লাবে তাকে সভানেত্রী করে নেওয়া হ'ল।

সেদিন মনোরমাকে অনিবার্যরূপে বারে বারে চোখে তার পড়ছিল। গান গাইছে কে, উদ্বোধনী সঙ্গীত? মনোরমা। গানের দলের নেতৃত্ব করছে কে? মনোরমা। মেয়েদের ব্যায়ামে কমাণ্ড দিচ্ছে কে? মনোরমা। দৌড়ে এসে প্রেসিডেন্টকে বসানো, তক্ষুণি আবার ছোট মেয়েদের নাচের

নির্দেশ দেওয়া, বয়স্কা মহিলাদের কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া, সেই একটি মেয়েই একা করে যাচ্ছিল। সমস্ত উৎসব-ক্ষেত্রে সে ছিল সচল দীপশিখা।

তারপরে জানা গেল দীপশিখা থাকে বাড়ীর কাছে। কখনও একটা—দুটো গানও দেখিয়ে নিয়ে যেত শ্রীমতীর কাছ থেকে।

তারপরে প্রেমে পড়ল দীপশিখা। নিজের চেয়ে অনেক নীচু ঘরের ছেলে। অনেক বাধার পর বিবাহ হ'ল। লুচি-কালিয়ায় ভরা পেটে আশীর্বাদ করে এসেছিল শ্রীমতী। তারপরের তিন চার বছরের মধ্যেই সচল দীপশিখা হ'ল কালিঝুলি মাখা অচল কুপী। হ্যাঁ, কেরোসিনের টিমটিমে কুপী একটা, মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। ভয় হয়, পথের মধ্যেই নিভে না যায়।

কেন যে মনোরমা প্রেমে পড়ল? হয়তো কত কি কাজ ও করতে পারত, সার্থকতা খুঁজে পেত। তা না, মরি-বাঁচি ভাবে শেষে সেই প্রেমই প্রতিপাদ্য হ'ল ওর। আর কিছু নয়? প্রেম মানে কি? অযোগ্যের প্রেমে আত্মবিলোপ। নীতি-কাহিনী হয়, জীবন-দেবতা আর খুশী হন না। হালের বাস্তবতা যে তাঁকেও স্পর্শ করেছে।

কেন যে প্রেমে পড়ে মেয়েরা, কেন যে আবার আমি পড়ছি না? হলফ করে বলতে পারি, যদি বিয়ে না হয়ে যেত, শুধু আলাপ হ'ত, তাহলে আমি প্রেমে পড়তাম এই স্বামীরই। জীবনটা কত সহজ হয়ে যেত!

নিশ্বাস আবার পড়ল শ্রীমতীর। কিন্তু, আপাততঃ কি করা যায়? কুপী ছাড়ছে না, নিজের বাড়ীতে একদিন নিয়ে যাবে-ই ও।

"এ বাড়ীতে তো তোমার সঙ্গে দেখা হয় অতদূরে যাবার দরকার কি? আমি তো প্রায়ই এসে থাকি, তুমিও আসা-যাওয়া কর। আবার তোমার শ্বশুরবাড়ী যাবার দরকার কি?" ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করেছিল শ্রীমতী।

মনোরমা সবেগে বলে উঠেছিল, "না না, শ্রীমতীদি, আমার বাড়ীতে নেবই আপনাকে। যেতে-ই হ'বে। গরীব বোন বলে কি বড়লোক দিদি যাবেন না।"

অকাট্য আবেদন। বিরক্ত হয়ে শ্রীমতী প্রতিবাদে নিরস্ত হয়েছিল।

সেই জোরে যখন গতকাল মনোরমা এসে বলল, "কাল কিন্তু যেতেই হ'বে, শ্রীমতী দি। উনি এসে নিয়ে যাবেন আপনাকে।"

শ্রীমতী নানা অজুহাত দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে নিরস্ত হ'ল। নিরুপায় ক্রোধে গা জ্বলে যাচ্ছিল ওর।

সারাটা দিন অশান্তিতে কাটল শ্রীমতীর। চেনা নেই, শোনা নেই, বেহালার এক অখ্যাতনামা বাড়ীতে যাবার দায়িত্ব এত লোক থাকতে তার স্কন্ধে পড়ে কেন? মধুর ব্যবহার শ্রীমতীর। সামান্য পরিচয়েও অন্তরঙ্গতার দাবী করে বসে পরিচিতেরা। কোন মেয়ের শ্বশুরবাড়ী 'বড়াইবুড়ি' সেজে গোটা একটা সন্ধ্যা নষ্ট হোক আর কি।

আয়াস আমি পছন্দ করি না, অনায়াস আমার জীবনের মটো। তবু কি এই ধরণের অবাঞ্ছিত কাজ করতে হ'বে। সন্ধ্যায় নিয়মিত কেউ না কেউ স্তাবক আসে। বসবার ঘরে ঘষা কাঁচের আলোর নীচে সভা জমে ওঠে। রজনীগন্ধার সৌরভে উতলা হয় রাত্রি। এক একটা দিন আমার সঞ্চয়। অতর্কিতে কারুর অধর-ওষ্ঠ থেকে ঝরে হয়তো পড়বে কোন বাণী, সেই কথা, যা এক মুহূর্তে আমার অনন্ত আলস্যকে শক্তি-সাধনায় রূপান্তরিত করে তুলবে।

আমার যে দিন নেই। মেয়েরা বোঝেনা কেন, আমার যে দিন নেই। তাদের সঙ্গেই তো জীবন কাটাচ্ছি। ষোল পর্যন্ত ছিলাম প্রমীলার রাজ্যে, কারণ পুরুষ থাকলেও আমাকে নারী মনে করেনি। তারপরে ক্ষণ-অভ্যুদয়—চিত্রাঙ্গদার বিজয়। আবার বিবাহের পর নারী-মণ্ডল চাইছে গ্রাস করতে। শাশুড়ী-জা-ননদ ইত্যাদিরা প্রকাণ্ড থাবা বসায় সময়ের থলেতে। পিত্রালয়ে মা-মাসী-বৌদি-পিসী লালায়িত হয়ে ওঠেন—দাও, দাও, আমাদেরও দাও তোমার সময়।

স্বামী আছেন—করগ্রাসে তার কমনীয়তা শ্রীমতীর অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। রজনীর মোহিনী নয়, শয়নের সঙ্গিনী। এই ছুটীর দিনকটা হলি-ডে শ্রীমতীর। এখনও কি কর্তব্য করতে হ'বে? হেসে কথা বলেছি বলেই কি খাল-খন্দ ভেঙে তার শ্বশুরবাড়ীতে ছুটতে হ'বে। আমার সঙ্গে আলাপ আছে এই গৌরব দেখাতে হ'বে তাকে। তাই আমাকে যেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তার মাষ্টারণী—ননদ, কেরানী-ভাসুরের সঙ্গে বাজার-দর আলোচনা করতে হ'বে? আমার একটি দুর্লভ সন্ধ্যা বন্ধ্যা করে দিতে হ'বে একজন মেয়েকে, যার ওপর আমার কোন আকর্ষণ নেই? যার মেয়েত্ব আমাকে পীড়া দেয় মাত্র?

আমার যে দিন নেই ! আজও জীবনে সঞ্চয় পেলাম না। স্বামী আছেন। দেহের প্রয়োজন মেটে। কিন্তু চির ক্ষুধার্ত মন হাত প্রসারণ করে আছে। এক মুহূর্ত বৃথায় কেটে যেতে দিতে পারি না আমি। কে জানে কখন ডাক আসবে?

স্বপ্ন দেখল শ্রীমতী, দিবানিদ্রার স্বপ্ন। দিব্যি মোটাসোটা বছর চল্লিশের প্রৌঢ়া একজন ! চওড়া লালপাড় সাদা শাড়ী, ঢিলে সেমিজ পড়ে বিছানায় গড়াচ্ছেন। সামনে কয়টা দাঁত বাঁধানো, মুখে পান জরদা। তাকে ঘিরে গাদা গাদা মেয়ে। একটিও পুরুষ নেই। মেয়েরা বলছে, "আমার স্বামীর একটা কাজ করে দিন;" "আমার দিন চলেনা, কিছু টাকা ধার চাই;" "আমার গানের গলা আছে, শেখা হচ্ছেনা, একটু গান শেখান;" "আমার মেয়ের পড়াটা একটু বলে দেবেন, পাঠিয়ে দেব।" ইত্যাদি বহু কাজের কথা।

কে এই প্রৌঢ়া? চমকে উঠল শ্রীমতী—এযে সে। হায়, হায়! এই কি তার পরিণতি, অ্যাঁ? সে তন্বী তরুণী গেল কোথায়? কোথায় গেল শ্রীযুক্তা শ্রীমতী? তার দিনরাত্রে চাওয়ার থাবা বসিয়ে বসিয়ে মেয়েরা তাকে এখানে নামিয়েছে। অতএব, মহিলাদের বর্জন। নারী লতারূ মত শুধু পুরুষ-সহকারে আশ্রয় নেয় না। আশ্রয় নেওয়া তার ধর্ম। শক্ত লতার গায়েই লতিয়ে ওঠে। সাহায্য করলেই চাই। সময় একটু দিলেই রক্ষা নেই। পুরুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওরাই নারীকে ঘিরে রাখে নিজেদের মধ্যে। দেখতে দেখতে সে মেয়ে ফুরিয়ে যায়।

ওগো তিরিশের খুকী, ভাবছ কি? দশ বছর পরেই তো ওই দশা হ'বে। সুতরাং দিনরাতকে রসে ভরে তোল যথাসাধ্য। যা পাওনি এখন, আর পাবে কি? সময় নষ্ট কোর না গো।

ঘুম ভেঙে বিরস চিত্তে বিছানায় বসল শ্রীমতী। না, সে তো ঠিক আছে। সেই কমনীয় কান্তি, ললিত পেলবতা। যেতেই যখন হ'বে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বেশ-সংস্কারে মন দিল শ্রীমতী।

আমাকে নিয়ে যেয়ে সস্তা বাহাদুরীর লোভ ছাড়া কিছু নয়। কঠিন মুখে সাজ করল শ্রীমতী। সাদা সিফন, সাদা মুক্তাহার। কি বা খাব ওখানে? কড়াপাকের দুটো সন্দেশ ও কমলালেবুর সরবৎ খেয়ে নিল।

মনোরমার স্বামী এল নিতে। শ্রীমতীর গাড়ী 'লিস্কনে' বসল উঠে; চলল বেহালা মুখে অনিচ্ছুক অতিথি। মনোরমার মনোনীত সস্তা আলাপে বাজার মাত করবার চেষ্টা করলেন পথে। বয়সে গাছ পাথর নেই; অথচ শ্রীমতীকে 'দিদি' ডেকে ন্যাকামী দেখ! মনোরমার আর যা হোক, ন্যাকামী নেই। গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা মনোরমার স্বামীর। দেখে গা জলে গেল শ্রীমতীর। এমন একটি ধুরন্ধরকে ভালবেসে বিবাহ করে দারিদ্র্য ও দুঃখ বরণ করবার মানে বোঝেনা শ্রীমতী। দায়ে-সারা সংক্ষিপ্ত কথা বলে গাড়ীর এককোণে শ্রীমতী চুপ করে বসে রইল।

বেহালায় সারি সারি নূতন বাড়ী হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কলোনীতে আনকোরা নূতন গৃহপুঞ্জ। কোনটা শেষ হয়েছে, রং পড়েছে, অথচ দরজা জানালা বর্ণহীন। কোনটা বালির আস্তরণে শেষ, কোনটা অর্ধেক তৈরি।

একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ। শ্রীমতী কুঞ্চিত ললাটে কাঁচা নর্দমা বাঁচিয়ে ভেলভেটের চটি-পরা পা ফেলল।

দরজার কাছেই সবিনয়ে প্রতীক্ষা করছিল মনোরমা। হঠাৎ তাকে যেন চিনতে পারল না শ্রীমতী। বধূসুলভ লজ্জায় মাথায় উঠেছে শান্তিপুরী শাড়ীর আঁচল। কপালে বড় করে সিঁন্দুরের টিপ, খালি পা, সব কিছুতেই লেখা আছে এটা তার শ্বশুর পরিবেশ। মিটমিটে কুপী বটে; যেন শিখাটা উস্কে দেওয়া হয়েছে।

এত করেও শ্বশুরবাড়ীর মন পেলনা বেচারী। সম্মানিতা অতিথি রূপে। বাড়ীর ভাল ঘরটিতে বসতে বসতে মনোরমার গার্হস্থ্য জীবনের ভুলে থাকা কথাগুলো মনে পড়ে যেতে লাগল শ্রীমতীর। এতদিন এসব কথা ভাববার অবকাশ পায়নি সে নিজের ছোট জগতে ডুবে থেকে। এখন ভেবে দেখল, মনের কোণে মনোরমার কথা চাপা ছিল। সময় ও সুযোগ পেয়ে বার হয়ে এল। কিছুই হারায় না মনের কাছে।

প্রেমের বিবাহ। দোষ পড়ল বৌ বেচারীর ঘাড়ে। নবনীত মনোনীতকে ভুলিয়ে নেবার জন্য। আজন্ম-দাসত্ব হাতের লৌহ বলয়ে বরণ করে মুখ বুঁজে কলেজের পড়া ছেড়ে রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দেবার জন্য। বড় বাড়ী ছেড়ে কাঁচা রাস্তার কদর্যতাকে আশ্রয় করে স্বাধীনতা, আনন্দ বিসর্জন দেবার জন্য। বিনেপয়সার ঝি-বামনী বারমাস পাবার জন্য।

মনোরমা সুন্দরী, মনোরমা শিক্ষিতা, মনোরমা বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়ে। তার অপরাধ, শ্বশুর-শাশুড়ী স্বজন-সমভিব্যাহারে দশবার মেয়ে দেখে, দশথালা মিষ্টান্ন আকণ্ঠ গিলে, বহুবার দর-দস্তুর করে বিবাহ ঠিক করবার অবকাশ পেলেন না কেন ? বেহায়া ছেলে কোথাকার একটা ধিঙ্গি এনে ফেলল! বাবা, ধন্যি মেয়ে! মায়ের পেট থেকে পড়েই আচ্ছা ছেলে ধরা শিখেছে মেয়ে। হ'বে না ? লেকের পাড়ের বেপরোয়া সব। নির্লজ্জের ধাড়ী। গিলে খেতে চায়, চিবোনোর সবুর সয়না, দেখ। আবার বাপের কাণ্ড দেখ। নগদে একটি পয়সা ঠেকাল না। অথচ খাট-আলমারী টেবলে ছোট বাড়ীখানা ভর্তি করে দিল। দে না দু'পাঁচ হাজার নগদে, বুঝি মেকদার। গ্র্যাজুয়েট পাত্র, চাকুরী করছে। এমন নিজের বাড়ী রয়েছে! পাঁচ হাজার নগদে কি চেষ্টা করলে আমরা পেতাম না ?

রাজ্যের শাড়ী দিয়ে পয়সা নষ্ট করেছে। সোনা দেবার বেলায় গোনা-গাঁথা ক'খানি মাত্তর। আ-মরণ, গেরস্তবাড়ীর বৌ এত শাড়ী জামা দিয়ে করবে কি ?

আহা, ভাবন দেখ! ভাসুর বাড়ী থাকতে আবার গান ধরা চাই সুন্দরীর! চোখ উল্টে অমন নাকী সুরের গান ছাই করে লাভ কি ? তবু যদি এক আধখানা কেত্তন জানত।

এদের মন যোগাবার দুরূহ সাধনা মনোরমার। নইলে—মনোরমার স্বামীর নাম ভুলে গেছে শ্রীমতী—মনোনীত বলেই ভাবে তাকে। মনোরমার মনোনীত! নইলে, মনোনীতের যে দুঃখ হ'বে।

বিরক্তিতে শ্রীমতীর মন বিষিয়ে উঠল। জা, ননদ ও বাড়ীর মেয়েরা ঘিরে বসেছে শ্রীমতীকে। মনোরমা অল্প-সল্প কথা বলছে। শ্রীমতীদি যে দয়া করে তার বাড়ী এসেছেন, তাতেই সে ধন্য। এর বেশী চাওয়ার বুঝি কিছু ছিল না তার।

আবার অনিবার্যরূপে মহিলা-মণ্ডলী। কি দিতে পারে এরা শ্রীমতীর মত মোহিনীকে ? শ্রীমতীর শিল্পীমনের যে ক্ষণে ক্ষণে অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে, সে অনুপ্রেরণা কে দেবে তাকে ?

মনোরমা চা করে আনল। আয়োজন দেখে শ্রীমতী অবাক। যত রকম খাবার জানে ও, বোধ হয় সবই করেছে। একদিনে নিশ্চয় নয়, দু' তিন দিন ধরে। নারকেলের নাড়ু থেকে ডিমের কচুরী। কড়াপাকের সন্দেশ আর কমলায় ভারাক্রান্ত শ্রীমতীর পাকস্থলী আর্তনাদ করে উঠল।

মনোরমা সমস্ত খাবার এমন করে খাওয়াতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যেন ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে শ্রীমতীর আহারের ওপর। অতি কষ্টে ওর হাত এড়িয়েও যা জোর করে গলাধঃকরণ করতে হ'ল, তার প্রভাবে শ্রীমতীর অতি-ভোজনের ফলে গা গুলোতে লাগল। মনে মনে বাড়ী থেকে খেয়ে আসবার অবিমৃষ্যকারিতায় সে নিজেকে ধিক্কার দিল। মিঠে পান সযত্নে গুছিয়ে দিয়ে এতক্ষণে কাছে বসল মনোরমা। হাতে একখানা পাখা তার। বাড়ীতে বিজলী থাকলেও পাখা ঘোরায় না।

অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল শ্রীমতীর। বৌ-এর ওপরে যে এঁরা বেশ প্রসন্ন নন, সেটা বুঝে নিয়েছিল সে, আগের শ্রুতি মিলিয়ে মিলিয়ে। এমন পরিবেশের অপ্রীতিকরতা চাপা দেবার উদ্দেশে বলে উঠল, "একটা গান কর না, মনোরমা। অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।"

মনোরমা অপ্রতিভ মুখ নামিয়ে বলল, "কি আর গান আমি আপনার কাছে করব, শ্রীমতীদি? তাছাড়া, অভ্যেস নেই তেমন।"

বড়-জা সম্মানিতা অতিথির সম্মুখে দরদ দেখালেন, "করনা গান একটা, মেজবৌ। আর, তুমি তো ভাল গানই গাও।"

অতএব হ'ল আনা যন্ত্র। তক্তপোষে পা গুটিয়ে বসল মনোরমা। কি গান গাইবে সে বিষয়ে শাশুড়ী-জা নির্দেশ দিলেন।

আজ কিন্তু মনোরমা কথা শুনলনা, বলল, "আমার একখানা গান গাইতে ইচ্ছা করছে, সেটাই গাই।"

গান ধরল সে—

"জীবন যখন শুকায়ে যায়—করুণাধারায় এসো।"

প্রকৃত গায়িকা ছিল সে। মুখের প্রতি রেখায়, কণ্ঠ-কম্পনে ফুটে উঠল শিল্পীর পরিচয়।

আত্মবিস্মৃত মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে ভাবল শ্রীমতী, সত্যই গান ভাল

গায় ও। অন্তর ওর সুরকে স্পর্শ করে, শুধু কণ্ঠ নয়। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট মুখে ওর ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় লাবণ্য, যেন অনেক পেয়েছে সে। কিন্তু কি পেয়েছে মনোরমা? কি দিয়েছে মনোরমা? দেবার ও তো অনেক ছিল!

সঙ্গীত-অন্তে বিদায় নিল শ্রীমতী। সন্ধ্যাটা কাটল বৃথা। কি আর করা যায়?

সকলের অগোচরে যাবার সময় কাছে সরে এল মনোরমা, সকলের অগোচরে বলল, "আজকের গান কিন্তু, আমি আপনার জন্যই গাইলাম—আপনি ওইরকম—আমার শুকনো জীবনে আপনাকে আমার অমনি করুণাধারা বলেই মনে হয়। শ্রীমতীদি, একবার কাছে এসে, জানেন না, আমাকে কত দিয়ে যান আপনি।"

একমুহূর্তে শ্রীমতীর বন্ধ্যা সন্ধ্যা অপরূপ এক উপলব্ধিতে ভরে উঠল। নিজের ছোট জগতে তুচ্ছ মানসিক বিলাস নিয়ে মগ্ন ছিল সে। প্রকৃত বেদনা সে জীবনে জানেনা। সখের বিরহ তার, সখের হুতাশ।

সম্মুখের ব্যক্তিটি কিশলয়তুল্য তরুণ স্তাবক, কি সংসারভারক্লিষ্টা অকাল-প্রৌঢ়া একটি তরুণী, এ বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। বন্ধ্যা সন্ধ্যা মাধুর্যে অবগাহন করে এল। ঘনীভূত রাত্রি আজ বিফল প্রত্যাশা নিয়ে আসছে না। আছে আজকের বুকে শ্রীমতীর পরম সঞ্চয়। উপলব্ধিই একমাত্র মানদণ্ড, পাত্র পাত্রী গৌণ। যে দিতে জানে, সে বেদনার মধ্যেও দিতে পারে, নিতে পারে।

জীবনে কেউ শ্রীমতীকে এমন করে বলেনি!

রত্নাদের ফ্ল্যাটের তেতালার ঘরটি আমার বড় ভাল লাগে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই এক সরু করিডোর, তাই থেকে বেরিয়ে' গেছে ঘরটা পেছনের দিকে বাড়ীর। দুই দিকে ঘরের বন্ধ সাদা দেওয়াল, একদিকে কাল পরদা-ঢাকা দরজাটি। অন্যদিকে ঘরের বড় দু'টি জানালা খুলে গেছে হঠাৎ। সেই জানালার নীচেই একটুকরো চমৎকার ঘাসের জমি। এ ঘরটা যেন হঠাৎ ফুটে ওঠা ফুলের মত বৃহৎ ফ্ল্যাট বাড়ীর মাথার ওপরে শোভা পাচ্ছে। এ ঘরের সঙ্গে বাড়ীর কোন যোগাযোগ নেই যেন। তাই এখানে রত্নার বন্ধুদের আড্ডা জমে ভাল।

এই ঘরে বিকালবেলায় সবাই এসেছি চা খেতে। প্রধান অভ্যাগতা শ্রীযুক্তা সাধনা সেন। দেশ-সেবিকা তিনি, ছোটখাট নেত্রীও এখন বলা চলে। বহুদিন বোমা-ষড়যন্ত্র আসামী হয়ে জেলে ছিলেন। রত্নার অন্যান্য বন্ধুরা এসেছে জীবনের নানাদিক থেকে। কেউ বা অধ্যাপিকা. কেউ কেরানী, কেউ বিবাহিতা, কেউ সমাজ-কর্মী। 'হংস মধ্যে বকো' আমিও আছি উপস্থিত, ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী হিসাবে।

সাধনা সেনকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশে রত্না সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে আসর সাজিয়েছে। ফরাসে আমরা বসেছি, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির ছবি ফুলের মালায় ঘেরা হয়েছে। ধূপ জ্বলেছে। নানা জানা-অজানা দেশীয় খাদ্য মধ্যে রেখে আমরা গোল হয়ে বসে খেয়ে চলেছি।

কাঠের ট্রে দুই হাতে ধরে রত্না আমাদের মাঝখানে নামাল। বড় থালায় আলুভাজার মত গোল ও পাত্‌লা সুদৃশ্য আস্কে পিঠে একটা বাটীতে খেজুরে গুড়, একটা বাটীতে নারকেল-কোরা। রত্না সকৌতুকে বলে উঠল, "সাধনাদি, মনে পড়ে?"

"কতদিনের কথা, না?" সাধনা সেন মাথা নামিয়ে চামচে দিয়ে পিঠে তুলে নিলেন, পিঠেতে গুড় ও নারকেল-কোরা ঢাললেন।

"কি ব্যাপার, রত্না? তোমার প্রেমের ইতিহাস না কি?"—ইন্দিরা সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

"আরে না, না। বলব সাধনাদি?"

"এখন আর বলতে কি? বল। সেইদিন জীবনে একটি বড় সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম।" সাধনা সেন বললেন।

রত্নার মুখে, এই পাড়াগেঁয়ে আস্কে পিঠের সঙ্গে যে ইতিহাস জড়িত হয়েছিল, সেটি শোনা গেল।

জেল থেকে সদ্য ফিরেছেন সাধনা সেন। তাঁর বড় বোন একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন কলিকাতার বাসা-বাড়ীতে, নিজের শ্বশুরালয়ে। রত্নাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল, কারণ রত্না দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।

সাধনা সেনের আস্কে-প্রিয়তা সর্বজনবিদিত। তাই প্রথমেই তাঁর পাতে আস্কে পিঠে পড়েছিল।

সাধনা সেন দু'চারখানা পিঠে মুখে তুলেছেন মাত্র। সহসা পাশের ঘরে বোমা ফাটল—"বোমার আসামীকে ডেকে আহ্লাদ করে খাওয়ানো হচ্ছে। তারপর মর তুই গুষ্টিশুদ্ধ জেলে পচে।" গলার স্বর দিদির শ্বশুরের। তিনি ডেপুটী ছিলেন। সম্প্রতি তোড়জোড় করে 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়েছেন। বড় বোন ছোট বোনের দিকে একবার চেয়ে চমকে উঠে গেলেন। সাধনা সেন খাওয়া বন্ধ করে কাঠের মত বসে রইলেন।

সেই গলা চীৎকারে ফেটে পড়তে লাগল, "আমি শুনলাম বৌমার ছোট বোনকে খেতে বলা হয়েছে। এখন শুনি জেল-খাটা বোমার আসামী। আমার বাড়ীতে এসব চলবে না।"

অন্য একটি ভারী গলা বলল, "এই যে বৌমা, তুমি এসেছ। বোন, বোন আছে, দূরে থাক। যে কাজ করেছে, তারপরে আবার সমাজে মেলামেশা করতে আসে কেন?" স্বর ভাশুরের।

রত্না সাধনা সেনের হাত ধরে আসন থেকে তুলল, "চলুন, আমরা যাই।"

অর্ধভুক্ত পিঠে হাত থেকে নামিয়ে সাধনা সেন বেরিয়ে এলেন। দিদির জলভরা চোখের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হ'ল মাত্র।

আজ সাধনা সেন বল্লেন, "সেইদিন বুঝলাম আমার পথ, আমার জগৎ আলাদা হয়ে গেছে। আত্মীয়-বন্ধু আমার সঙ্গে মিশতে ভয় পায়, পুলিশের চোখ পড়বে বলে। সকলের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে বুঝলাম এ কথা। কিন্তু, বিপদ হ'ল আমার। জেলের মধ্যে যতদিন ছিলাম, বেশ ছিলাম নিজের পরিবেশের মধ্যে। বাইরে এসে দেখলাম সমাজ-জীবনে আমার জায়গা বড় সঙ্কীর্ণ। অথচ সেই সমাজেই বাস করতে হবে আমাকে।"

সাধনা সেন বল্লেন, "যদি একজন মধ্যবিত্তের গলায় মালা দিয়ে, হাতভরা চুড়ি আর গালভরা পান নিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ী-বাড়ী পরচর্চা করতে বেড়াতাম, তাহ'লে আমার মূল্য দিত সমাজ। খদ্দর প'রে নাওয়া খাওয়া ভুলে পাগলের মত এ কয়টা বছর পথে পথে ফিরেছি। কি পেয়েছি জান? অনুকম্পা আর তাচ্ছিল্য।"

নীলিমা ধীরে ধীরে বলল, "এখন তো সেদিন চলে গেছে।"

সাধনা সেন উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কিছুটা। প্রমাণ, সেই দিদির শ্বশুর আজ আমাকে ধরেছেন অমুক এম্-এল-এর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে দিতে হ'বে তাঁর নাতির চাকুরী জুটবে। তবু, দেশ এগিয়েছে? কিছু না। আজ মন্ত্রী কংগ্রেস, তাই কংগ্রেসের কাছ ঘেঁসে চলবার চেষ্টা করছেন আমাদের মধ্যবিত্তেরা, তাঁরা দেশের সেবক বলে নয়। এখনও সৌখিনতার পরিচয় সাহেবিয়ানাতে। আমি শুধু ভাবছি, আমার ব্যক্তিগত সমস্যা তো মিটেছে, কিন্তু জাতীয় সমস্যা এত সহজে যাবার নয়। আমরা আজ স্বাধীন হ'তে যাচ্ছি, কিন্তু তারপরে? আমাদের নিজস্বতা কোথায়?"

সকলে নিঃশব্দে শুনছিলাম। একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকিত হলাম।

একপাশে মলিনা রায় বসেছিল গোলাপী রং-এর 'মানে না মানা' শাড়ী পরিধান করে। গোড়া থেকেই তাকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

নীলিমা মলিনার দিকে তাকিয়ে বল্ল, "কি মনা, সাধনাদির কথাগুলো খুবই সত্যি, নয় কি?"

বিমূঢ়ভাবে মলিনা বল্ল, "অ্যাঁ, কি বলছ?"

সাধনা সেনের কোন কথা যে তার কর্ণগোচর হয়নি সেটা বেশ বোঝা গেল।

রত্না টিপে টিপে বল্ল, "ওর যে নিজেরই সমস্যা রয়েছে। জাতীয় সমস্যা ওর কানে পৌঁছবে কেমন করে?"

মলিনার কাহিনী সবাই জানে। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর প্রেম হয়েছিল, তিনি সম্প্রতি মাতৃভক্ত ব'লে অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি করেছেন। মলিনার বিষণ্ণমুখ অন্যমনা দৃষ্টি দেখলেই অন্তর্বিপ্লব ধরা যায়।

সাধনা সেন কথার মোড় ফেরাবার উদ্দেশে বললেন, "মনকে বড় করে দাও, মনা। প্রেমের সমস্যা একটা আছে সত্যি, কিন্তু সেটা বিলাস মাত্র। তুচ্ছ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। দেশের জন্য ভাবতে শেখ।"

মিনতি চুষির পায়েস খেতে খেতে মন্তব্য কাটল,—"এতরকম খাবার করেছিস, রত্না! লোকে ঠিকমত র‍্যাশন পাচ্ছে না, বাজারে আটা-ময়দা-চিনি কিছুই নেই। কমাতে কমাতে সরকার আধপেটার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ বন্ধুদের ডেকে তুই চব্য-চষ্যের ব্যবস্থা করে অন্যের ভাগে হাত দিচ্চিস। তোর শাস্তি হওয়া উচিত।"

অপ্রতিভ রত্না উত্তর দিল, "বাজে কথা রাখ। ভারী করেছি আয়োজন, এতে আবার অন্যের ভাগ কমাচ্ছি!"

ইন্দিরা চা-এ চুমুক দিয়ে বল্ল, "এখন আর কি? কি দিনটাই গেছে! সাধনাদি, তুমি তখন জেলে। এই তেতলার ঘরেও বসে স্বস্তিতে থাকবার উপায় ছিলনা। 'এক মুঠো ভাত দাও', 'একটু ফ্যান দাও' শব্দ এখানেও সব সময় ভেসে আসত।"

সাধনা সেন বল্লেন, "গেছে বোলনা, নীলিমা, নিশ্চিন্ত হয়ে। যে কোন মুহূর্তে আবার সেই দুর্ভিক্ষ ফিরে আসতে পারে।"

রত্না চীৎকার করে বাধা দিল, "না না, বোলনা, সাধনাদি। সেদিন সভ্য-জগতে ফিরে আসতে পারে না। তারা সব চলে গেছে। সত্যি, অত লোক! কোথায় গেল তারা?"

সাধনা সেন গম্ভীর হয়ে নিজের মনে বল্লেন, "তারা সব মরে গেছে।"

চায়ের মজলিসে আমি একটি কথাও বলিনি। আমি ছিলাম শ্রোতা মাত্র। কিন্তু মনে কথা এতই বেশী জমেছিল যে আমার অবচেতনার অন্তরাল থেকে স্বপ্ন উঠে এল কথার মুক্তি নিয়ে।

দেখলাম আবার সেই চায়ের আসর। সকলে অস্পষ্ট ছায়ার মত দূরে সরে চুপ করে বসে আছে। শুধু স্পষ্ট হয়েছি আমি আর সাধনা।

সাধনা রত্নাকে বলছেন, "রত্না, তুমি যে আমার জন্যে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় আয়োজন করেছ এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। চায়ের টেবল পেতে ফিরপোর কেকের বাক্স তুমি যে খুলে দাওনি, এতে আমি কৃতজ্ঞ আছি। এই আস্কে পিঠে, চুষীর পায়েস, তিলের মেঠাই—রত্না, এসব কবে ঘরে ঘরে চায়ের টেবলে সাজানো হবে? কবে বিদেশী আয়োজনের মোহ থেকে আমরা ছাড়া পাব?"

শুনলাম রত্নার স্বর নয়, আমার স্বর। ভীরু-কুনো মেয়ের স্বর নয়, দৃপ্ত-স্পষ্টকণ্ঠ—"কেন ছোট ছোট জিনিসে অযথা জোর দিচ্ছেন আপনি? যদি কারুর কেক্ ভাল লাগে, তাতে ক্ষতি কি? যদি সখ করে কেউ একটা বিলিতি লিপ ষ্টিক কেনে তাতে আপনারা চটে যান দেখেছি। কিন্তু মোগলাই পোলাও, চৈনিক আঙরাখা, এতে আপত্তি নেই। স্বকীয়তা কি এত ছোট জিনিসে ধরে রাখা সম্ভব? আচার-ব্যবহারে আমরা বিশ্ব-নাগরিকতার অভিমুখে চলেছি, ভারতবর্ষীয় কুশাসন অথবা মেজেতে জলচৌকী রেখে লেখা কোনটাই পোষায় না। সম্পূর্ণ ভারতীয়তায় যদি ফেরা না যায় তাহ'লে বিশ্ব-নাগরিকতা অবশ্যম্ভাবী। শুধু বিলিতিতে আপত্তি কেন? ভারতবর্ষ ছাড়া যে কোন দেশই তো আমাদের কাছে বিদেশী?"

সাধনা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "জাতীয়তা সব রকম বিদেশী বর্জনে।"

"না, জাতীয়তা অত ছোট নয়। আজ ইংলণ্ড আমাদের কাছে যে কোন

দেশমাত্র, প্রভুশ্রেণী নয়। নিজের দেশের উৎপন্ন দ্রব্য নেবার পরে এবং ভবিষ্যতে বিদেশে পাঠাবার পরে কেউ সখ করে ভাল লাগে বলে কিছু ইংলিশ বা অন্যদেশী জিনিস কিনলে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়! তা'হলে তারাই বা আমাদের জিনিস নেবে কেন? এসব নেহাৎ বাইরের কথা। জাতীয়তা একটা বড় অখণ্ড কিছু। সেটা ঠিক বিদেশী-বর্জনে যতটা নয়, ততটা মনে প্রাণে দেশীয় গ্রহণে, যার শেষ-সোপান দেশপ্রেম।"

"তুমি বলতে চাও, আমরা নিজস্বতা বিদেশীর সঙ্গে কারবারে ভাসিয়ে দেব? আমরা যদি সম্পূর্ণ বিদেশীবর্জন না করি, আমাদের দেশের কুটীর-শিল্পের কি হবে?"

"শুধু কুটীর-শিল্পের কথা বলছেন কেন? নিজস্বতা মানে আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে। কই, আপনাদের তো এসব বিষয়ে উল্লেখ করতে দেখি না।"

সাধনা অসহিষ্ণুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "রাজনীতির বাইরে আছ তুমি। দেশের সমস্যা তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন।"

দপ করে রত্নার ঘরের ইলেকট্রিক আলো নিভে গেল, ক্ষীণ নীল আলোয় সে ঘর প্লাবিত হ'ল। মেজেতে কে যেন পারসিক গালিচা বিছিয়ে দিল, একগুচ্ছ গোলাপ সাজাল। গোলাপী শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে মলিনা বসে আছে উন্মনা হয়ে। অন্য সমস্ত ছায়া মিলিয়ে গেল। রইলাম আমি এবং মলিনা।

"আচ্ছা, আমার সমস্যা কি খুবই তুচ্ছ মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে বিলাস? আজ তো আমার কাছে এর চেয়ে বড় অন্য কিছুই নেই। বড় জগৎ তো চাইনি আমি। সঙ্কীর্ণ কোণের সুখই আমার কাম্য ছিল। সেটুকু না হ'লে আমার বেঁচে থাকার মূল্য খুঁজে পাচ্ছি না।"

গোলাপ-গুচ্ছ ছিঁড়ে ফেলে দিতে আমি বললাম,—আবার আমার কণ্ঠ স্থির-বিশ্বাসী দৃঢ়,—"ন্যাকামি রাখ, মনা। সত্য প্রেম ক্ষণস্থায়ী নয়, তাকে বিলাস আমি বলি না। কিন্তু, তুমি সে প্রেমের কি জান? তা'হলে তো আজ ঘরে ঘরে রোমিও-জুলিয়েট, লয়লা-মজনু, সাবিত্রী-সত্যবানের ছড়াছড়ি পড়ে যেত। তোমার প্রেম প্রথম উপযুক্ত পুরুষের প্রতি মোহ মাত্র। দ্বিতীয় ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেই তুমি ধাতস্থ হ'বে। তিনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান

করেছেন বলেই এত ভেঙ্গে পড়েছ তুমি। নিজে যদি করতে পারতে তবে শুধু প্রেমে বিন্দুমাত্র মমতাও তোমার থাকত না। তোমার আবার দুঃখ, তোমার আবার সমস্যা!"

"তুমি কি বুঝবে?" মলিনা প্রতিবাদ জানাল,—"জীবনে কারুর প্রেমে পড়নি, প্রেমের সমস্যা তোমার বুদ্ধির অতীত।"

রত্নার ঘরে এবার লাল আলো জলে উঠল নীল আলোর বদলে। মলিনা মিলিয়ে গেল দূরে। গোলাপ আর গালিচা অন্তর্হিত হ'ল। কতকগুলি জীর্ণ-শীর্ণ প্রেতমূর্তি লাফালাফি করতে লাগল। তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমি।

"ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে উঠে এসেছ, ভিখিরীর দল। যাও, বেরিয়ে যাও।"—শুনলাম আমার কণ্ঠ দ্বিধা-ভীতিতে উচ্চারণ করছে।

"আমরা যে মরে গেছি। মরে গেলে তো সবাই সমান।"

"কি চাও তোমরা?" দুই পা পিছিয়ে গেলাম।

"কি চাই আমরা?"—সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল—"কি চাই আমরা? কেন? ফ্যান চাই, একমুঠো ভাত চাই।"—আমার কাছে ঘিরে এল তারা,—"ওগো ভালমানুষের মেয়ে, বক্তৃতা করে তো সকলের কাছে গলা ফাটালে। দেশনেত্রীর সঙ্গে, সমাজ-দুলালীর সঙ্গে। এখন আমরা একটু বক্তৃতা করি শোন।"

একজন ক্ষুধিত-মূর্তি এগিয়ে এল, "বক্তৃতার সময় নেই। আমাদের সঙ্গে এস।" তা'রা আমার হাত ধরে রত্নার সুসজ্জিত ঘর থেকে বাইরে টেনে আনল। আমার প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে নিয়ে চলল শহর ছেড়ে দূরের পথে।

দেখতে দেখতে কলকাতা মিলিয়ে গেল। এব্ড়ো-খেব্ড়ো মেঠো পথ, জমির আল ধরে, নদীর পাড় ঘেঁষে, চষা ক্ষেত আর খোলা মাঠ পেছনে রেখে খোড়ো ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম প্রেত-মূর্তিদের দ্বারা তাড়িত হয়ে।

"মুখে বল, India lives in Villages, অথচ সেই গাঁয়ে তো কদাচিৎ আস তোমরা। শহরে ড্রইংরুমে বসে বড় বড় কথা বলে দেশের সমস্যা আলোচনা কর তোমরা। তোমাদের দেশ তো ওখানে নেই। চেয়ে দেখ আসল সমস্যা কি?"

চেয়ে দেখলাম। চালে খড় নেই, গোয়ালে গরু নেই, ভাঁড়ারে চাল নেই। ফুটো মাটির কলসী বদলিয়ে চারটি পয়সা খরচ করে নূতন কলসী কিনবার সামর্থ্য নেই। বউ, ঝি বসে আছে ঘরে দোরে আগল দিয়ে, একখানি আস্ত কাপড় নেই অঙ্গে। শরীরের সুস্থতা বহুদিনই গেছে, মুখের হাসি, মনের আনন্দ। নৈতিক মানদণ্ড ভূমিসাৎ হয়েছে। নিরানন্দ ডোবার ধারে পচা পাঁক ঠেলে, কচুরী পানার রাজ্যে, ম্যালেরিয়া-বাহক মশার সঙ্গী হয়ে এই টুকরো-টুকরো গ্রামগুলিতে কে আসবে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে চরম ব্যর্থতা থেকে মুক্তি দিতে? তাদের ক্ষুধায় অন্ন যোগাবে কে?

দেশের সংস্কৃতি বজায় রাখা নিজস্বতার মধ্যে, অথবা প্রেমের কি সমস্যা ইত্যাদি কথা নিয়ে আলোচনার দিন নেই। সে সব সমস্যা পরের পর্যায়ে, আপাত সমস্যার মীমাংসা এখন চাই।

"দেখেছ? গত মন্বন্তরে আমরা মরেছি। এই সব গ্রাম থেকে পাগলের মত অন্ধ আশায় ছুটে গিয়েছিলাম আমরা তোমাদের শহরে। সেই যে ঘরে বসে তোমরা চা খাচ্ছিলে, সেই ঘরেরই জানালার নীচে। আবার আমরা মরব। বারে বারে আমাদেরি মরতে হচ্ছে। আমাদের কি তোমরা বাঁচাবে না?"

দেশ আমার কোথায়? আমার দেশ তো মাটির ঢেলা নয়, একখণ্ড শ্যাম-ভূমি নয়, আমার দেশ আমার দেশবাসী।

সেই স্বাধীনতায় আমার কি প্রয়োজন, যে স্বাধীনতা আমার কোটি কোটি দেশবাসীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না? এরা সংস্কৃতি বোঝে না, বিদেশী-বর্জন জানে না। দিল্লীর তক্ত-হাউসে কোন নূতন দেবতা সমাসীন হ'ল, সে-খবর এদের কানে পৌঁছয় না। এরা শুধু চায় ক্ষুধার অন্ন পেয়ে পশুর মত দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে অজ্ঞতা-অশিক্ষায় পঙ্কলীন হয়ে। সেই ক্ষুধার অন্ন তাদের আজ জুটছে না—এই সমস্যা। জীবনের প্রথম সমস্যা মিটলে তবে মানুষ দেখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। তারপরে স্বাধীন মানুষ আহ্বান করে প্রেমকে।

আমার দেশবাসীর প্রেত-মূর্তি আমাকে স্বপ্নে বলে দিল, এ দেশের প্রকৃত এবং প্রধান সমস্যা কি।
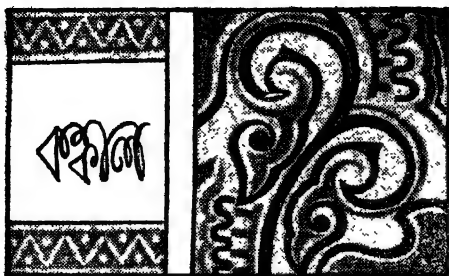
লীলা কালো বাক্স খুলে জামা-কাপড বার করছে। ভাইদের সংসারে থাকে সে। পাড়ার মহিলা-সমিতির অবৈতনিক কর্ম-সচিব হয়েছে কিছুদিন। তার ঘরে খাটের নীচে একটা বাক্স রাখা আছে সযত্নে পুরনো কাপড় ঢাকা দিয়ে। 'চকচকে কালো, চ্যাপ্টা। আজকাল যে ধরনের বাক্স চলতি।

লীলা বাক্স বা'র ক'রে ডালা তুলে একটি একটি জামা মাদুরের উপর নামাচ্ছে। কি সুন্দর সঞ্চয়! সিল্কের সাদা ধবধবে শেমিজ, হাতে-গলায় দামী লেস বসানো। চাঁপা রঙের সিল্কের পেটি-কোট, এক হাত চওড়া সাদা লেসের ঝালর। গোলাপী স্যাটিনের কাঁচুলি। নীল জর্জেটের অন্তর্বাস। টাওলিঙের ড্রেসিং-গাউন। বাসন্তী রেশমের উড়নি। সাদা সিল্ক-স্যাটিনের ইলাষ্টিক বসানো অধোবাস। পরিধেয় শুধু নয়, সৌন্দর্য। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে। সাজিয়ে দেখাবার, দেখবার জিনিস। আলমারিতে, শো-কেসে পুতুল সাজিয়ে লোককে দেখানো হয়। সুন্দর জামা-কাপড় কেন সাজানো হয় না, বিশেষ ক'রে লীলার মত পোষাক যদি হয়? কাটছাঁট কি চমৎকার! মানানসই কাপড়ের মানানসই ট্রিমিং। কথাগুলোর পরিভাষা জানা না থাকায় লেখা গেল না।

না, লীলাকে আপনারা যা ভাবছেন সে মোটেই তা নয়। ধনীকন্যা, বিলাসিনীর যে অতিপরিচিত মূর্তি এই সব পোষাকের পটভূমিকায় ভেসে আসছে, আমার লীলা সে নায়িকা নয়। সাধারণ ঘরের মেয়ে, ভাইরা

রোজগার ক'রে আনে, দিন চ'লে যায়। রূপাভিমানও তার নেই যে জন্য ধারধোর ক'রে বিলাসসজ্জা চয়ন করবে সে। শ্যামবর্ণ চেহারা, চোখ চুল নিষ্প্রভ, ঠোঁট কালচে। রূপ নেই, লাবণ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই।

তবে কি লীলা লঘুচিত্তা? রূপহীন শরীরকে বেমানান পোষাকে সাজিয়ে লোকচক্ষে তুলে ধরবার উদ্দেশে টাকা জমিয়ে বা চেয়ে-চিন্তে এইসব বস্তুর সমাবেশ করেছে? এ ধারণা মিথ্যা। লীলা গম্ভীর, স্বল্পভাষী। তা ছাড়া, ওর বয়স হয়েছে।

লীলা বিলাসিনীও নয়। কন্ট্রোলের মোটা সাদা শাড়ি, রঙ-চটা খদ্দরের জামা পরনে তার, চুল টেনে-টুনে বাঁধা। সত্যি বলতে কি, লীলা যা, তাই যদি না হ'ত, তবে মহিলা-সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও হতেই পারত না। যে যত শোভন নয়, সেখানে তার তত আদর। সুরুচিসঙ্গত পোষাক আর কর্মের সমন্বয়, প্রেসিডেন্ট মিসেস পাকড়াশীর মতে, হয় না—হতে পারে না। রুখু চুল, আলুথালু পোষাক, ময়লা জুতো, এসব হচ্ছে মহিলা সমিতির কর্মীদের চিরস্থায়ী বিশেষত্ব। দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে, মুখ শুকনো, বেশ অপরিচ্ছন্ন —এইভাবে কর্মীরা দোরে দোরে ঘোরে চাঁদার খাতা হাতে। যদিও পাড়ার মধ্যেই চাঁদার চাঁদোয়া সীমাবদ্ধ। দেখা হ'লেই শোনা যায়, 'বড় ব্যস্ত আছি। যথেষ্ট কাজ বাকি। দাঁড়াবার সময় নেই।' দেড়-আঙ্গুলে প্রতিষ্ঠানের আধ-আঙ্গুলে কর্মীদের অতিব্যস্ততা দেখে সকলে চমৎকৃত হয়। পিছু ধাওয়া করলে দেখা যায়, বিনা কারণে উদ্দেশ্যহীনভাবে তারা পথে পথে চলাফেরা করছে এ-মোড় থেকে ও-মোড়। একবার দাঁড়ায় ট্রামের লাইনে, একবার দৌড়োয় বাস-স্টপে। কিন্তু ট্রাম বাস কোনটাতেই ওঠে না।

লীলাও একটি কর্মী—ছয় মাসের সদস্য, দুই মাসের সেক্রেটারী। বাড়িতে শোনা যায়, লীলার কত কাজ, সময় নেই। গেঁয়ো বউদি বেচারীরা নির্বিচারে ননদের প্রাধান্য মেনে নেয়। সত্যিই তো, এক মুহূর্ত স্বনামধন্যা ননদ বাড়ি থাকে না। নাওয়ার সময় পায় না, চুলের সামনে কবিরাজী পাকতেল থাবড়ে ক'ঘটি জলে ভিজিয়ে শিরোপীড়ার হাত থেকে অব্যাহতি নেয়। খাওয়ার সময় ঠিক নেই, ভাত লোহার ঢাকার নীচে ভোক্তার প্রতীক্ষায় শুকিয়ে শক্ত হয়। লীলা দেশোদ্ধারের ব্রত নিয়েছে।

তাই কি? কি এসব সৌখিন বিলাস দ্রব্য নিয়ে দিবাস্বপ্নে সময় নষ্ট করছে কেন লীলা? অন্যের জিনিস নিশ্চয়। কার হ'বে? আধাবয়সী সংসার-পীড়িতা বউদিরা। লীলা এক বোন। মা গত হয়েছেন। বাবা পেন্‌শন ভোগী। তাই বোধহয় সংসারে অরক্ষণীয়া কন্যার দর আছে। লীলার মা, আত্মীয়স্বজন, তাদের এমন পোষাক থাকা অসম্ভব।

লীলার বিয়ে নাকি? দেশোদ্ধারব্রতধারিণী বিবাহবিরাগিনী নন, দেখা গেছে। সমুদ্র বন্ধন গ্রহণ করে—সেতুবন্ধ-যুগ থেকে। আর, সামান্য জংলা ডোবা লীলা। রাতারাতি খদ্দর, চটমাক্ষিক বস্তুর ত্যাগ ক'রে শ্রীমতী লীলা বিলাসিনী হয়ে উঠলেন কি? কোন বিলাসী সংগৃহীত হয়েছে বোধহয়।

কই, না। লীলার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে? এসবের অর্থ কি? এত চমৎকার সজ্জা নাড়াচাড়া করছে যে, তারই বা মুখখানা বিরস কেন? দামী জিনিস কেনবার অথবা তৈরি করবার পয়সা ও পেল কোথায়? আর, যদিই বা করল, সব অন্তর্বাস কেন? দামী জামা-কাপড় এ দামে কিনলেই হ'ত? এ ধরনের জিনিস পেলই বা কোথায় ও?

এ অনেকদিন আগের তৈরি, প্রাক্-যুদ্ধের দিনে। মা এক মেয়ের বিবাহের আয়োজন একটু একটু ক'রে করছিলেন। পুরনো কাপড়ের বদলিতে বাসনপত্র কিনে রাখছিলেন। সস্তায় জামা করাচ্ছিলেন। এখন সব আয়োজন ফেলে রেখে পরকালের বিপুল মৃত্যুযানে উঠে চ'লে গেছেন। লীলা একলা। বাসনপত্র বার ক'রে দিয়েছে সে সংসারে। জামা-কাপড় যা ছিল, প'রে ফেলেছে। কিন্তু একান্ত শৌখিনতায় ভরা বাক্সটি প্রাণে ধ'রে খুলতে পারে নি। লুকিয়ে রেখেছিল খাটের নীচে। অবশ্য বাক্সটির মধ্যের জিনিস-পত্রে আর লীলার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এত প্রভেদ যে ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখন কোন শৌখিন বন্ধুকে উপহার দিতে একটি টাকাও হাতে থাকত না, তখনও একটা কিছু বাক্স থেকে বা'র ক'রে দিয়ে লীলা নিজের মান রক্ষা করতে চেষ্টা করে নি। এই তো সেদিন আদরিণী ভগিনী-নন্দিনী মন্দাকিনীর বিবাহ হয়ে গেল। বাক্স খুলে নীল সিল্কের পেটি-কোটটা বার ক'রে দিতে গিয়েছিল লীলা তাকে—এটা পেয়ে মন্দা কত খুশি হ'বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি সে। অধোবাস ফিরে গিয়েছিল তার বসতিতে।

কিন্তু আজ সেদিন নেই। লীলার ঘড়িতে রাত্রি বারোটা বেজে গেছে নূতন দিনের আগমন সূচিত ক'রে। Vanity of vanities—all vanities!—লীলা বুঝেছে, এগুলো মা করালেও প্রকৃতপক্ষে করিয়েছিল লীলাই। ওপরে পরবার জামা-কাপড় অপেক্ষা শৌখিন অন্তর্বাস চিরকাল তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। মা আধুনিকা ছিলেন না, কিন্তু প্রচেষ্টা-পরায়ণা ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের শৌখিনতার স্বাদ পেত লীলা পরের মুখে ঝাল খাবার মত। দোকানে গেলেই লীলা ধাবিত হ'ত যেখানে স্লিপ, ক্যামিসোল, নাইটি ইত্যাদি। বাইরে গুরুগম্ভীর মেয়েটির অন্তঃপ্রকৃতির চাবিকাঠি ছিল ওর পরিচ্ছদ-মনোনয়নের গতি। যুদ্ধের আগের দিন, বারো আনায় এক গজ ভাল স্যাটিন পেত, দুই আনার বিডিং, দর্জি নিত এক টাকা। সহজে শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত হ'ত। লীলা নানা ফিকির-ফন্দি বার ক'রে, বহু ঘোরাঘুরি ক'রে এসব যোগাড় করেছিল। গরম-মসলার পুরিয়া, ন্যাপ্‌থলিন, কর্পূরের চাকি ভাঁজে ভাঁজে দিয়ে সযত্নে আজও তোলা আছে। ভাদ্র-আশ্বিনের রোদে ঠিক পড়ে।

কতদিন লীলা বাক্স খুলেছে, এত সাধের জিনিস ভুলে রেখে নষ্ট করবে কেন? বিয়ে তার হ'বে না। বিরাট টাকার অঙ্ক অথবা বিরাট প্রেম ভিন্ন বিশেষত্ব-বর্জিত কালো, মেয়ের বিয়ে হয় না। নিজেই প'রে ফেলবে এসব। যখন করিয়েছিল, তখন উপযোগিতা সম্পর্কে ভেবে দেখে নি। পরতে গিয়ে বুঝেছিল।

এই তো কুশ্রী, নিষ্প্রভ লীলা। ফ্যাশন, প্যাশনের ধার ধারে না। তবু অবচেতন মনের কোন্ দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিতে সে বেচারী এমন সমস্ত পোষাক ক'রে ফেলেছিল, যা তন্বী-শ্যামা-শিখরিদশনাকেই মানায়। তা ছাড়া, তার প্রাত্যহিক বেশভূষা ও সাংসারিক অবস্থায় এমন বিলাস হাস্যকর।

মা নেই। বিয়ের আশা নেই। কে চেষ্টা করে, কে দেয়? লেখাপড়া এমন কিছু শেখে নি, যাতে বর্তমান কর্ম-প্রতিযোগিতায় স্থান পেতে পারে। বাবা মেয়েদের চাকরি করা ভালবাসেন না। আগে মহিলা-সমিতিতেও আপত্তি ছিল। সম্প্রতি মেয়ের "ন ভূতো ন ভবিষ্যো" দেখে রাজী হয়েছেন। অল্পদিনে লীলা কর্মী হিসাবে নাম ক'রে ফেলল মিসেস পাকড়াশীর নজরে পড়ে। যে আবেগ নিয়ে লীলা বেমানান পোষাক করেছিল, সেই আবেগ

নিয়ে মহিলা-সমিতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে, পূর্বতন কর্মসচিব ছেড়ে দিলে লীলা সুযোগ পেল।

মিসেস্ পাকড়াশী, তথা মহিলা-সমিতি আজ লীলার ধ্যান-জ্ঞান। মিসেস্ পাকড়াশী বিদেশ-প্রত্যাগতা।

বৈদেশিক আঁচে স্বদেশী সুরা চোলাই হচ্ছে সেখানে। রোজ 'Scriptures' পড়া হয়। বাইবেলের দিনে 'Vanity of Vanities—all Vanities' বোঝাবার প্রসঙ্গে মিসেস্ পাকড়াশী কটমটে দৃষ্টি শেলের চশমা থেকে মেয়েদের দিকে হানতে হানতে বলতে লাগলেন, "Look at the Lilies of the Valley—" তারা বিনা সজ্জায় সুন্দর।

লীলার মনে হ'ল, কথাগুলো আসছে সোজা তার দিকে। সজ্জা সে করে না। ভ্যানিটি কোথায় তার? ওই যে বাক্সটা, কালো বাক্সের স্কেলিটন! লীলার মনের একটা নীচ দিক আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ও-বাক্সে। ভূত তাড়াতে হ'বে।

মন শক্ত ক'রে ধীরে ধীরে লীলা মাদুরে নামাল জিনিষগুলো। চরম মূল্যে চরম ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন। বিলিয়ে দেবে সে—সৎ লোকেরা যেমন নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। ত্যাগ করবে সে। ভারতবর্ষের, মহাত্মার দেশের লোক। ত্যাগই করবে। একটি একটি ক'রে জামা-কাপড় তুলতে লাগল লীলা। সত্যি, এগুলো শেষাশেষি কোন কাজেই এল না! অথচ কি আদরের ছিল! কতদিনের স্বপ্ন ছিল এগুলো ঘিরে!

কেউ জানত না, বাইরে গুরুগম্ভীর, সাদামাটা লীলা প্রত্যহ শয়নকক্ষে নৈশদ্বার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জীবন আরম্ভ ক'রে দিত। বহুদিন বাক্সটি বের হয়েছে, জামা-কাপড়গুলো বিছানায় ছড়িয়ে ব'সে লীলা ভেবেছে, তার বিবাহ হ'বে সুন্দর তরুণের সঙ্গে। এগুলো লীলা পরবে। রাতারাতি শৌখিন হয়ে উঠবে সামান্য লীলা—এলা-বেলা-লোলার মত। অন্তর্বাস্! সুতরাং—সলজ্জ পুলক ফুটে উঠেছে লীলার চোখে-মুখে। দৈনন্দিন জীবনের শেষে রাত্রি,—ভোগসঙ্কুল। রাত্রির বসনে চাই বিশেষত্ব।

কিন্তু পারবে না লীলা। বিলোতে পারবে না সে। ক্ষতি কি? এত সাধের জিনিষ! শাড়ির নীচে বা বাড়িতে পরলে মিসেস পাকড়াশী টের

পাবেন না। স্বপ্ন-দিয়ে-গড়া পোষাক। প্রাণে ধ'রে একটিও অঙ্গে তুলতে পারে নি—হাতে নিয়ে ফিরে রেখে দিয়েছে। আজ জোর ক'রে ভোগ করবে লীলা। স্বপ্ন তো আর নেই।

লেস্-বসানো বকশুভ্র সিল্কের শেমিজটা তুলে নিল লীলা, এটা দিয়েই শুরু করা যাক। ধনেখালির লালপেড়ে শাড়িখানা এ শেমিজের সঙ্গে প'রে থাকা যাবে। বেশ মানাবে।

কিন্তু, ত্রিশোত্তীর্ণা স্থূলদেহা লীলার আর একবিংশা তন্বী তরুণীর দেহ এক নয়। সবিস্ময়ে লীলা অনুভব করল, তার প্রতীক্ষা যে বহুদিন মৃত হয়ে গেছে—সে কথা নূতন ক'রে জানাতে কালো বাক্সের কঙ্কালের প্রয়োজন হ'ল কেন?

"যাই বলুন শ্রীদেববাবু, বিজ্ঞাপন ছাড়া কি কাগজ চলে ?"

আমি বিরক্ত হইলাম। সম্পাদিকা সুচারুকণা দেবী যখন তাঁহার হরধনু ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের হ্যাংলামি সমর্থন করিলেন না, তখন অনুরক্ত স্তাবক আমি, শ্রীদেব গাঙ্গুলি কি করিয়া সমর্থন করিতে পারি ? সুতরাং, আমার কণ্ঠ প্রবল উৎসাহে বক্তৃতা করিতেছিল।

পত্রিকাটির অর্থ দিয়াছেন নারায়ণ গুপ্ত। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।

কোণার চেয়ার হইতে যে মেয়েটি প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, সে আমার চক্ষুশূল। কেন জানিনা প্রথম দিন হইতেই তাহার প্রতি আমার দৃষ্টিটা শুভ হয় নাই। কাল-কেলো চেহারা কই মাছের মত। কিন্তু তাজা সতেজ কই নয়—ভাজা কই। শুষ্ক ও শীর্ণ। মুখের মধ্যে চোখে পড়ে মাড়ি-বার-করা দাঁতের সারি। কথা বা হাসিতে প্রকট হইয়া পড়ে ; গায়ের মধ্যে ঘিন-ঘিন করিয়া ওঠে।

এমনি চেহারার কুন্তলা বসু। কমিশন লইয়া বিজ্ঞাপন যোগাড় করিবার কাজে লাগিয়াছে। আই এ পাশ করিয়া ছাপাখানার কেরানী পিতৃগৃহে অন্নচক্ষু যাপন করিতে করিতে সুচারুকণার দৃষ্টিপথে পড়ে। সুচারুকণা তখন নারায়ণ গুপ্তের অর্থে একখানি মহিলা-পত্র প্রকাশিত করিতেছেন।

আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী সুচারুকণা। ত্রিংশবর্ষ বয়স তাঁহার। ভাবী স্বামী বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তিনি অদ্যাপি কুমারী, অন্ততঃ নামতঃ। তিনি সুন্দরী, তিনি বিদুষী তিনি চমৎকারা, প্রাণহরা। অতএব আমি এম-এ পাশ বেকার যুবক তাঁহার দাসানুদাস।

প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনে একমাত্র আভিজাত্য ওই সুচারুকণার সঙ্গটুকু। পিতা কবিরাজ, বোনেরা ঘরের মধ্যে খলে ঔষধ মাড়ে, বাঙাল ভাষায় ঝগড়া করে। স্কুলের মুখ পর্যন্ত কেউ দেখে নাই। মাতা ছিনে-নাকে নাকচাবী আঁটিয়া খালিগায়ে রান্নাঘরে লাউঘণ্ট রান্না করেন। পিতা টিকিতে জবাফুল বাঁধিয়া ঘন-ঘন হাঁকেন, "মাগো, জগদম্বা!"

বাংলায় এম,-এ পাশ করিলাম, তারপর নারায়ণবাবুর সহায়তায় সুচারুকণার সহিত আলাপ হইল। হাসিমুখে সুচারু বলিলেন, "আমাদের অফিসে মাঝে মাঝে আসবেন, কেমন?"

আমি, বেকার যুবক কবিরাজ-তনয় শ্রীদেব গঙ্গোপাধ্যায়, হাতে স্বর্গ পাইলাম। 'মাঝে মাঝে' হইতে গতায়াত প্রত্যহ করিতে আরম্ভ করিলাম। বাড়ীতে মাতৃদত্ত ঘি-চিনি মাখা একবাটি মুড়ি গলাধঃকরণ করিয়া ছুটিতাম সুচারু সকাশে। বাড়ী ফিরিয়া টেংরা মাছের ঝোল-ভাত খাইয়া অর্ধমলিন শয্যায় তাঁহাকেই স্বপ্ন দেখিতাম। মনে হইত রুচি ও রূপের এমন সমন্বয় আর আমি দেখি নাই। আহা, কবে বা আমার জগৎ তাঁহার জগতে উন্নীত হইবে?

যদিও কুমারী বয়োজ্যেষ্ঠা তবু স্বপ্ন দেখিতাম—

বিজন বনপথ। আমি ও সুচারু। সহসা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে অনার্য দস্যু বিষতীর লক্ষ্য করিল। তীরবিদ্ধ হইয়া সুচারুর পদতলে পড়িলাম আমি—কারণ তীরের লক্ষ্য সুচারুকে আমি সরাইয়া দিয়া নিজে বুক পাতিয়া দিয়াছিলাম।

মাথা রহিল সুচারুর কোলে—প্রকাণ্ড দুইটি চক্ষে জল ভরিয়া সুচারু বলিয়া উঠিল, "ওগো, এ কি করলে!"

দারুণ রোগে সুচারু শয্যাশায়িনী। দুর্বল দেহে রক্তের প্রয়োজন—আমারি সবল দক্ষিণ বাহু হইল প্রসারিত। তাহার পর ক্ষীণ ছায়ার মত আমি অস্ত পাইতে লাগিলাম। শয্যাশিয়রে মলিনা সুচারু—"শ্রীদেববাবু, এ কি করলেন?"

কত চিত্র, চিত্র কত! আমি ও সুচারু, সুচারু ও আমি।

সুতরাং কুন্তলার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। উগ্রস্বরে ঝাঁঝালো উত্তর দিলাম, "ওহো, যাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিন কাটে, তাদের কি দশা? ভুলেই গিয়াছিলাম।"

বিবর্ণ মুখ নত করিয়া কুন্তলা নিজের পায়ের অর্ধছিন্ন চটি দেখিতে লাগিল।

সত্যই মেয়েটা জ্বালাইল। কাঠঠোকরার মত চেহারা, বেশভূষা তথৈব। অথচ রকম দেখ না? সর্ব ঘটে থাকা চাই। সুচারুকণা কোথায় আর কোথায় ও! তবু, সুচারুকণার প্রত্যেকটি কথায় তাহার কথা বলার প্রবৃত্তি, লোকের চোখে পড়িবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা আর কি।

আমি কিছু বলিলেই তাড়া করিয়া আসে, "ওকি বলছেন, শ্রীদেববাবু? এ কথা বলা চলে না।"

সুচারুর প্রতিটি মতামত কৌশলে খণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে কুন্তলা। তিনি উদারহৃদয়া, কিন্তু আমি বুঝিতে পারি যে দারুণ ঈর্ষ্যায় ছট্ফট্ করিয়া মরিতেছে মেয়েটা। ঈর্ষ্যা কেন? সুচারুর সহিত কুন্তলার মিল কোথায়? কোথায় সুচারুকণা, আর কোথায় কুন্তলা! সেই অসমতা প্রত্যেকের চক্ষে প্রকট হইয়া ওঠে। সেই অসমতার জন্যই সুচারুকে কুন্তলা ঈর্ষ্যা করে। কোন কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নাই। সুচারুকণা নিজে তাহাকে এমন বিদ্বৎসমাজে মেলামেশার সুযোগ দিয়াছেন। অর্থ উপার্জনের এমন সুলভ পথের দিশারী হইয়াছেন। অথচ তাঁহাকেই হিংসা!

আমি সুচারুকণার ভক্ত, তাই আমাকেও কুন্তলা দেখিতে পারে না। সুচারুকে সমর্থন করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঠোকর মারে। সাধ হয়, কুন্তলা নামের পরিবর্তে তাহাকে আমি 'কাঠঠোকরা' বলিয়া ডাকি।

অথচ একা থাকিলে, আমাকে তোয়াজ করিবার কম চেষ্টা করে না কাঠঠোকরা। একদিন হাতব্যাগ হইতে সাদা ন্যাকড়ায় বাঁধা ক্ষীরের চন্দ্রপুলি পর্যন্ত বাহির করিয়া ও আমাকে মাথার দিব্য দিয়া খাওয়াইয়াছিল। আমার অজস্র প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে নাই।

"কাল ভাইফোঁটা গেছে, শ্রীদেববাবু। রাত জেগে আমি বসে এগুলো

তৈরি করেছিলাম। টাটকা ক্ষীরের, আজও চমৎকার তাজা আছে। ক'খানা আপনার জন্যে আনলাম। খেতেই হ'বে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "বেশ, আমাকে ভাই বানাবার এত সখ জানালেই হ'ত। গত কালই যেয়ে হাজির হতাম।"

কুন্তলা খন্‌খন্‌ করিয়া উঠিল, 'সে কি কথা, শ্রীদেববাবু? ওমা ভাই, বানাতে চাইব কেন? দু'খানা খাবার খাওয়ানো মানেই কি ভাই বানানো!"

অপ্রতিভ হইলাম। আমার কথায় প্রতিবাদ করিতে করিতে মেয়েটা এত অভ্যস্ত যে ভাল কথারও প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে সে পারে না। তাছাড়া, আমাকে খাওয়াইয়া বশ করিয়া নিজের দলে টানিতে চায় ও; যাহাতে আমি সুচারুর বিরুদ্ধে মত দিতে পারি।

মনে মনে হাসিলাম। স্বর্গের অমৃত সেবন করাইলেও সুচারুর বিরুদ্ধাচরণ আমার দ্বারা অসম্ভব।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া কুন্তলা খপ্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিল, "মাথার দিব্যি আমার, খেতেই হ'বে।"

টাইপিষ্ট ছোকরা এককোণে টাইপ করিতেছিল, সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। বেয়ারা চায়ের জল গরম করিতে করিতে সাগ্রহে চাহিয়া রহিল।

আমি হাত ছাড়াইয়া নীরস স্বরে বলিলাম, "সামান্য একটা ব্যাপারে পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত মাথার দিব্যি দিয়ে ফেললেন! লেখাপড়া শিখেও আপনাদের কোন উন্নতি হ'লনা। একমাত্র সুচারু দেবীকে দেখলাম, মেয়েলী ন্যাকামীর হাত থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেছেন।"

সেদিন সুচারু আসেন নাই। লাল ভেলভেটের গদি-আঁটা তাঁহার শূন্য কেদারাটির দিকে চকিতে চাহিয়া সহসা করুণ কণ্ঠে কুন্তলা বলিল, "ওঁর মত আমি কি করে হ'তে পারি! সে আশা করেন কেন?"

আমার দেবীর স্তুতিতে প্রীত ভক্ত আমি নিঃশব্দে সবগুলি চন্দ্রপুলি গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু ক্ষীরের চন্দ্রপুলিতে আমার রুচি ছিল না, ছিল ক্রীস্‌মাস্ কেকে। তাহার সন্ধান পাইতাম সুচারুকণার কাছে।

একদিন নিরিবিলিতে সুচারুকে বলিলাম, "আচ্ছা, মিস্ কুন্তলা বসুকে এ কাগজের মধ্যে না রাখলে কি চলে না ?"

নতমুখে প্রুফ দেখিতে দেখিতে সুচারু বলিলেন, "কুন্তলার অবস্থা ভাল নয়। নিজের খরচ নিজের চালাতে হয়। এখানে দু-পাঁচ টাকা যা পায়, না পেলে ওর চলবে না।"

ধন্য! মহত্বে তুমি এতই শীর্ষে, যে তোমার ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইয়া মরিতেছে, তাহাকেও করুণা করিতে ভোল না! তোমার কাছে কুন্তলা! সূর্যের কাছে মাটির প্রদীপ।

ইতিমধ্যে বিশিষ্ট একজন সংবাদপত্রসেবী মারা গেলেন। পত্রিকার পক্ষ হইতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমরা শোভাযাত্রায় যোগ দিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। সুচারুকণা বলিলেন, "পায়ে হেঁটে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আমি তো পেরে উঠব না।"

সুচারুর শুভ্র রেশমের শাড়ী, হীরার দোলক শোভিত কণ্ঠহার, পায়ের জড়ির জুতা—সসম্ভ্রমে চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে আমি বলিলাম, "না, না। আপনি পায়ে হেঁটে যাবেন কি করে? ধূলো লাগবে যে।"

কুন্তলা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু ধূলোর দেহ তো একদিন ধূলোতেই মিশবে। সেই উপলক্ষেই তো যাওয়া হচ্ছে।"

চাহিয়া দেখিলাম কুন্তলার কাল রঙে আগুন জ্বলিতেছে। তৈলহীন রুক্ষ চুল এলোমেলো কাল জঞ্জালের মত বাতাসে কাঁপিতেছে। বিবর্ণ চুড়িপাড় শাদা শাড়ীতে ইস্ত্রির বালাই নাই। রংজলা খয়েরী খদ্দরের জামা। মাড়ি বার-করা দাঁতে দোক্তা পাতার ছোপ।

ঘৃণার সহিত বলিলাম, "দেহ ধূলো একদিন হ'বে বলেই কি আগেভাগে ধূলো মেখে গড়াগড়ি দেব! সকলের দেহই তো একরকম হয় না, মিস্ বোস।"

সুচারু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শ্রীদেববাবু, বাজে কথা রেখে একখানা গাড়ী ডাকুন। আমি গাড়ীতেই যাবো।"

কুন্তলার অপমানহত কুশ্রী মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া চলিয়া গেলাম

গাড়ীর সন্ধানে। সুচারুর দেবীত্বে দানবী সামান্য আঁচড় দিতেও পারে না, তবু চেষ্টার ত্রুটি নাই।

মহিলা-পত্রখানির একজন নূতন অংশীদার জুটিয়াছে। মহেন্দ্র সেন নারায়ণ চৌধুরীর সহিত যোগ দিলেন। সুতরাং রাতারাতি পত্রিকাটি উন্নত হইয়া উঠিল আর্থিক দিক হইতে। সুচারু কুন্তলার একটা মাহিনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমাকে দিয়াও একটা-দুইটা প্রবন্ধ লিখাইয়া অর্থের সমাগম সম্ভব করিলেন।

সামান্য অর্থ। কিন্তু, অপার কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিল। বেকার যুবকের হাতে দশটি টাকা দশটি মোহর, দশখণ্ড রত্ন। সারারাত্রি পুরাতন পুস্তকের পাতা উলটাইয়া নোট করিতাম। প্রভাতে বসিয়া দীর্ঘ-দুর্বোধ্য প্রবন্ধ লিখিতাম, চর্য্যাপদ, সহজিয়া মত, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি সম্বন্ধে। সন্ধ্যায় হাজির হইতাম সুচারু-সকাশে। শিরোনামা দেখিয়া তিনি বিস্ফারিত চক্ষে কহিতেন, "ওঃ, কি পণ্ডিত আপনি, শ্রীদেববাবু। কবে জগৎ আপনার মূল্য বুঝবে জানি না।"

দশ-পোনেরো পাইয়া বিস্ফারিত বক্ষে আমি ফিরিতাম। প্রাচীন শাস্ত্রে পণ্ডিত পিতার ভাঙ্গা আলমারী হইতে আরও দুর্বোধ্য পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমার দেবী আমাকে তো শুধু অর্থ দিতেছেন না, অনুপ্রেরণাও দিতেছেন। কয়জন এত দিতে পারে?

আমার চর্বিত-চর্বণ রচনাগুলির মাহাত্ম্যেই বোধ হয় পাড়ার বেসরকারী কলেজে পঁচাত্তর টাকার টিউটরপদ পাইতে বসিলাম। মাসে মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকার বেশী সুচারুকণার নিকট হইতে পাইতাম না। কিন্তু, এখানে বাঁধা টাকা, তদুপরি এ লাইনে অভিজ্ঞতার সুযোগ। পত্রিকার টাকা কোনবারেই নিশ্চিত ছিল না, এখানে নিশ্চিত। তাছাড়া মানও যথেষ্ট। পিতা প্রসন্ন হইয়া কাঁচা সন্দেশে গৃহস্থ শালগ্রামের ভোগ দিলেন।

গৌরবে হেলিতে দুলিতে অপরাহ্ণে সুচারুসকাশে পত্রিকার অফিসে গেলাম। যথারীতি আমার দেখিবার জন্য একতাড়া প্রুফ প্রস্তুত ছিল। সুচারুর কাজ আমিই করি।

সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে সুচারু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কাঠঠোকরা আনন্দিত হইল। বুঝিলাম সে আশা করিতেছে পত্রিকার অফিসে আমি নিয়মিত হানা দিতে পারিব না আর।

সুচারুর কণ্ঠ হইতে একটিও উৎসাহবাণী নির্গত হইল না। আমি আশা করিয়াছিলাম আমার সৌভাগ্যলাভে তিনি না জানি কতই খুশী হইবেন, কতই মিষ্ট উৎসাহভাষণে আমাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবেন।

অপ্রতিভ স্বরে বলিলাম, "কিছু বলছেন না কেন, সুচারু দেবী?"

কাঠঠোকরা ঠোকর দিল, "বলবেন আবার কি? আপনার একটা ভবিষ্যতের হিল্লে হ'ল, এতে আমরা সকলে নিশ্চয় খুশীই হব।

গম্ভীর-করুণ স্বরে সুচারু কহিলেন, "না কুন্তলা, আমি তো খুশী হ'তে পারছি না। প্রতিভার অপমৃত্যু দেখলে কি কেউ খুশী হয়?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কুন্তলা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মানে আর কি? শ্রীদেববাবু একজন প্রতিভা। কলেজে নিত্যকার ছেলে ঠ্যাঙানো আর পাঠ্য বইএর নোটলেখা আর পরীক্ষার খাতাদেখা, এতেই ওঁর জীবন নষ্ট হ'বে। এমন করে পড়াশোনা, এমন করে প্রাণ দিয়ে লেখা আর তো পাব না।"

আমি ক্ষীণ স্বরে চিঁ-চিঁ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম, "আমি পড়াশোনা করে যাবই, লেখাও বন্ধ হ'বে না।"

বাধা দিয়া সুচারু বলিলেন, "হয় না যা, তা কি করে হ'বে? আজ সাহিত্য আপনার প্রাণ। পত্রিকা ছাড়া আপনার অন্য চিন্তা নেই। একদিকে মন গেলেই অন্যদিক খর্ব হ'বে।"

কুন্তলা সবেগে বলিয়া উঠিল, "আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি না। অধ্যাপনার লাইন আর অধ্যয়নের লাইন ভিন্ন নয়। তাছাড়া, ব্যাগার খেটে একটা পুরুষ মানুষের সারা জীবন কি কাটতে পারে?"

সুচারুর প্রতি সুস্পষ্ট কটাক্ষে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু, আমার মুখ খুলিবার পূর্বেই সুচারুর গভীর আহত কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল,—"কুন্তলা ব্যাগার খাটা কাকে বলছ? একটা জীবনের সাধনা। আমার নিজের জীবনটাও কি

এই সাধনায় ব্যয় করছি না? অধ্যাপক হ'বার যোগ্যতা তো আমারও আছে। একখানা সাহিত্যপত্রকে দাঁড় করাতে হ'লে অনেকেরি আত্মত্যাগ, নীরব পরিশ্রমের দরকার হয়। আমি যা করছি, অন্যের কাছ থেকে তার আশা করা কি আমার অন্যায়, বল কুন্তলা?"

আমি অভিভূত হইয়া গেলাম "তাহ'লে আপনি আমাকে কাজটা না নিতে বলেন?"

প্রীত দুইটী পদ্মাক্ষি আমার দিকে তুলিয়া সুচারুকণা বলিলেন, "তা কি করে বলব? অন্যকে আমি নির্দেশ দিতে পারলেও দিতে আদেশ করতে পারি না।"

আমার বিমুগ্ধতা খান্‌খান্ করিয়া দিয়া কাঠঠোকরার খন্‌খনে গলা ধ্বনিয়া উঠিল, বা কি মজা! শ্রীদেববাবু একটা সুযোগ পাচ্ছেন, সেটা নষ্ট করে দেওয়া মানুষের কাজ নয়। পত্রিকা ওঁকে কিছুই তো দেয় না। বাবার হোটেল না থাকলে এতদিন না খেয়ে মরতে হ'ত।"

অহেতুক সহানুভূতির অপমানে কান গরম হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "আমার প্রতিভা আছে, এ যাঁর চোখে ধরা পড়েছে, তিনি মানুষ নন। তিনি দেবী। তাঁকে বোঝা বা তাঁর নির্দেশ বোঝা সকলের সাধ্য নয়। তিনি আমাকে যা স্নেহ করেন, পর তা কি করে জানবে? আমি তাঁর মতেই চলব। গোলামীর চাকুরি আমি নেব না!"

কুন্তলা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শীর্ণ তর্জনী কম্পিত করিয়া, রুক্ষ চুল উড়াইয়া, শাদা আঁচল খসাইয়া নাচিতে লাগিল যেন। কাঁদুনে মেয়েলী গলায় ঝগড়াটী বলিতে লাগিল, "বেশ, বেশ! আমি ওঁর পর, সুচারুদি আপন! বেশ, বেশ! আমি ওঁকে স্নেহ করি না, সুচারুদি করেন! ওঁর প্রতিভা কেবল সুচারুদি বোঝেন! সুচারুদির মতেই উনি চলবেন! বেশ, বেশ!"

আমি হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। অফিস শুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। সুচারু কিন্তু বিরক্ত হইলেন না। শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কি পাগলামী করছ, কুন্তলা। শান্ত হও।"

কুন্তলা যেন সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে। অভিযোগের ভঙ্গিতে সে

সুচারুর দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে লাগিল, "ছি, ছি! যাকে কিছুই দিতে পারেন না, তার জীবনে নিজের মত খাটিয়ে তার জীবনটা নষ্ট করে দেবেন না দয়া করে। আপনি দেবীই বটে, কিন্তু পাথরের।"

অসহ্য হইয়া উঠিল। সকলের সম্মুখে সুচারুর অবমাননা আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। উঠিয়া দাড়াইয়া বলিলাম, "কুন্তলা দেবী, সাবধান! আর আমি সহ্য করব না। আমাকে সুচারু দেবী যা দিয়েছেন, বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। আমাদের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে কেন আপনি? আপনি যদি চুপ না করেন এক্ষুণি আমি বেরিয়ে চলে যাচ্ছি। জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা আমি করব না।"

ঝড়ের বেগে কুন্তলা বাহির হইয়া গেল, "না, না। আপনারা যাবেন কেন? আমিই যাচ্ছি।"

আর কুন্তলা বসু অফিসে কোনদিন আসে নাই।

সুচারুর কাছে সরিয়া আসিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলাম, "আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আরামের গোলামী আমার জন্যে নয়। আপনার পথই আমার পথ। এ বাঁধাধরা সামান্য কাজ আমি নেব না।"

•

পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন,—"কি মতলবটা তোমার, শুনি? কলেজে পড়াবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল হ'বে। না, মেয়েদের মধ্যে যেয়ে গুলতুনী! ওহে বর্বর, আমি সব জানি।"

কথার ভঙ্গিতে হাড় জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, "আপনি কি বলতে চান?"

"আমি বলতে চাই বৎস, এখন অর্থ রোজগারে মন দাও। ভাল চাও তো ওসব পাল্লা ছেড়ে কলেজের চাকুরিটি নিয়ে নাও। তিরিশ বছরের আইবুড়ো কন্যা সর্পের সমান। আমি নাড়ী টিপি আর বড়ি পাকাই; ভেবে নিশ্চিন্ত আছ যে বাবা ওসব জানে না। না? সবই জানি। যদি চাকুরি নিয়ে বিবাহ করে সংসারী না হও তো জেন এ বাড়ীর অন্ন তোমার উঠল।"

সুচারুর বিষয়ে অসম্মানজনক উক্তিতে আমি ক্ষেপিয়া গেলাম, "মুখ সামলে কথা বলবেন, বাবা?"

বাবা মুক্তকচ্ছ অবস্থায় পায়ের খড়ম তুলিলেন, "আস্পর্ধা তোর বড় বেড়েছে

অনড্‌ান। কাকে কি বলছিস ? সেই অবিদ্বে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ করেছে। খড়মের ঘায়ে তোর আমি মুখে মুখে তর্ক ঘুচিয়ে দিচ্ছি, কুত্তা !"

মা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বোনেরা দ্বারের আড়াল হইতে মজা দেখিতে লাগিল। আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "আমাকে যা খুশী বলুন, সুচারুদেবীকে একটি কথাও আপনি বলতে পারবেন না। আপনি কাকে কি বলছেন জানেন না ? আপনার ভাল হ'বে না—আমি আপনাকে উচিত শিক্ষা দেব, বাবা।"

"তবে র্‌য়া বলীবর্দ"—বাবার নিক্ষিপ্ত খড়ম আমার গায়ে লাগিল না. আমি ততক্ষণ দরজার বাহিরে। সামনের চেয়ার টানিয়া পথ বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। বাবা আমাকে তাড়া করিতে যাইয়া চেয়ার বাধিয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মা কাঁদিয়া উঠিলেন। বোনেরা ছুটিয়া আসিল কিন্তু উগ্রক্রোধী বাবার ভয়ে গায়ে হাত দিতে সাহস করিল না।

বাবা ভূতলশায়ী অবস্থায় চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আজ থেকে তুই আমার ত্যজ্যপুত্র। এ বাড়ীতে পা দিলে তোকে আমি পুলিশে দেব। এত বড় আস্পর্ধা তোর, কুত্তা, তুই আমাকে শাসাস্‌ আর আমাকে ফেলে দিস ?"

অবাধ রাজপথ। বড় ভগ্নিপতির কাটা কাপড়ের দোকান আছে। সেখানে আশ্রয় লইলাম। মান বাঁচাইতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া পাইস্‌-হোটেলে আহারাদি করিতে লাগিলাম। বাবার অন্ন উঠিলেও ক্ষতি হইল না, কিন্তু বাবার পুস্তকের সাহায্য না পাইয়া চোখে সরষের ফুল দেখিতে লাগিলাম। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সব, আমার পাণ্ডিত্য সেইখানেই নিহিত আছে। কি যে করি ! সুচারু অনুযোগ দিতে লাগিলেন, "কই, আপনার ওসব প্রবন্ধ কোথায় গেল ? আপনার পাণ্ডিত্যের জন্য আমার কাগজের নাম হয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি একটা লেখা দিন।"

একটা দায়-সারা উত্তর দিয়া সরিয়া আসি। মনে মনে ভাবি যে, আবার বাবার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া পুনর্মূষিক হইব নাকি ? কিন্তু যেখানে আমার দেবতার অপমান ঘটিয়াছে, সেখানে ফেরা চলিবে না। গতানুগতিক জীবন যাপন করি। ভগ্নিপতির দোকানে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে

সাহায্য করি। কখনও বা অনিচ্ছুক মনে ভাসিয়া আসে কুন্তলার কথা—জীবনে বাঁধাধরা ভিত্তিরও প্রয়োজন আছে। বইগুলির অভাবে আমার প্রতিভা মৃত। কিনিবার বা সংগ্রহ করিবার সামর্থ নাই। পিতার হোটেলে নিশ্চিন্ত অন্নের নির্ভরতা যে কতটা, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সুচারু বা কি ভাবিবেন? অচিরাৎ একটা পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার নিদর্শন দেখানো যে চাই-ই। ভাবিলাম, গোপনে কিঞ্চিৎ পিতার পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ফেলিব। কিন্তু, ভগ্নিপতির মুখে পারিবারিক খবর শুনিয়া মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

বাবা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইংরাজি স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতে ছাড়াইয়া টোলে দিয়াছেন, যাহাতে সে আমার মত বিগড়াইয়া না যায়। মধ্যম ভ্রাতাকে টুলো-পণ্ডিতের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া কবিরাজী ব্যবসায়ে বসাইয়াছেন। সমস্ত পুস্তক পাঠাগারে দান করিয়া আমার ছবি ও পুস্তকগুলি ভস্মসাৎ-পূর্বক আমার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করিয়াছেন। উইল করিয়া আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন। তিন বোনকে একদিনে তিনটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সুচারুকণা সেনের সহিত শ্রীদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ সম্ভাবনায় ভীত পিতা নিজের জাতি রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই অতি দ্রুত করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং, পিতৃগৃহে সত্যই আমার স্থান নাই। কিন্তু, আহা! পিতার শঙ্কিত সম্ভাবনা যদি সত্য হইত? যদি আমাপেক্ষা পাঁচবৎসরের বড় কুমারী আমারি কণ্ঠে মাল্য দিতেন! আহা!

সহসা আমার জীবনে করকাপাত হইল। বিপর্যয় ঘটিয়া গেল! সুচারুকণা দেবী একত্রিশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বিদ্বানকে নয়, প্রতিভাকে নয়, গুণীকে নয়—টাকার জালা মহেন্দ্র সেনকে।

আমার দেবী অবশেষে সাধনার পথ ছাড়িয়া সহজ পথে পা দিয়াছেন। কিন্তু আমার কি হইবে? অর্ধাহারে দিন কাটিতে ছিল তবু সুখস্বপ্নে। আজ বাস্তব আমার কি করিল?

নব-বিবাহিতা সুচারুকে একদিন নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা জানাইলাম বাধ্য হইয়া। সফরী নয়ন নাচাইয়া তিনি বলিলেন, "ওমা, আমি তো এত জানতাম না। তা'হলে তখন চাকুরি নেওয়াই আপনার পক্ষে উচিত ছিল। আমি আর কি করতে পারি?"

মনে পড়িল কুন্তলার কথা—'পাথরের দেবী।' তাই তো। কুন্তলার উপর তিনি রাগ করিতেন না, কারণ রাগের ক্ষমতা তাঁহার নাই। আমার উপরে তিনি করুণা করিতেছেন না, কারণ করুণার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। মানুষ নিষ্ঠুর হইতে পারে সে মানুষ বলিয়াই। আবার দয়া করে সে মানুষ বলিয়াই। পাষাণের দোষ নাই সত্য, কিন্তু হৃদয়ই বা কোথায় ?

তারপরে কয়েকটি বৎসর সংগ্রামের ইতিহাস। ভগ্নীপতি ভ্রূকুটী করিতে লাগিল। ভগ্নী পাশের বাড়ীর কৃষ্ণকায়া ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল সুযোগ বুঝিয়া। একটি দুইশো টাকার কেরানীগিরি কন্যার মামা দিবেন—এই প্রতিশ্রুতি।

আমি তখন অসহায়। পিতা মুখ দর্শন করিবেন না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমার দেবী দৈত্যকরতলগত হইয়া গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার স্মৃতিসুখের আনন্দও আমার নাই। পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে। এক একদিন কুন্তলার কথা মনে হইত—চন্দ্রপুলি খাওয়াইবার ব্যগ্রতা ভুলি নাই। কিন্তু, সে কোথায় তাহাও জানিনা। পাশের বাড়ীর করুণাকে গোপনে দেখিলাম। মুখখানি ভাল লাগিল। দুইশো টাকা আমার কাছে অনেক। এখানে অধ্যাপনার মোহ না থাকিলেও মাহিনা আছে। সুতরাং একদা শ্রাবণের বর্ষারাত্রে করুণা গললগ্না হইলেন। এমনি করিয়াই আমার ক্ষণ-প্রতিভার অবসান ঘটিল।

এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষে আসিয়াছি অবশেষে। ভদ্র জীবনযাপনের সুযোগ হাতে আসিয়াছিল বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার রূপে। পিতার অর্থ হইতে বঞ্চিত হইলাম। কুরূপাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। কাহার জন্য ? তাহাকে দোষ দিই না। আমি মূর্খ পাষাণে প্রাণ দিয়া মরিলাম। কিন্তু, আরও একজনকেও তো চিনিতে পারি নাই। সে শেষ মুহূর্তে চিনাইয়া দিল। মানুষকে যখন বিশ্বাস করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তখন একজন মানুষ বলিয়া দিল হৃদয় কি।

অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। পুত্রকন্যাপরিবৃত আমি দুইশত টাকার দরিদ্র জীবন দশটা-পাঁচটা করিয়া কাটাইতেছি। দেশ বিভাগের ফলে

বাড়ীর দাম চতুর্গুণ হইয়া গিয়াছে। আমার বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়াছেন নিজে থাকিবেন বলিয়া।

পঁয়ত্রিশ টাকায় একতলার তুইখানি ঘর লইয়া আছি প্রায় পাঁচ বছর। বাজার, স্কুল কাছে। পাগলের মত বাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু, অগ্রিম, কালোবাজার, বর্ধিত মূল্য পদমর্যাদা কোনটাই যোগাইতে না পারায় বাড়ী জুটিল না। এধারে বাড়ীওয়ালার বাক্যবাণে মান লইয়া থাকা চলিবে না বুঝিলাম।

মনে পড়িল পৈতৃক বাটীর নিশ্চিন্ত আরাম। পুরাতন ঢংএর বাড়ীখানা লইয়া বিদ্রূপ করিতাম। এখন অন্ধকার গলির ছোটঘরে শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় পাঁচবৎসর কাটাইয়া মূল্য দিতে শিখিয়াছি। সে বাড়ী এখন আমার কাছে স্বর্গ। কে আমাকে বঞ্চিত করল?

করুণা কান্নাকাটি করে, "ওগো, আর সহ্য হয় না। যা-তা বলে বাড়ীউলী অপমান করছে। খোলার ঘরে চল। তা-ও আমার ভাল।"

"খোলার ঘরের ভাড়া কত জান, করুণা? একখানা ঘর, আলো নেই। চল্লিশ টাকা ভাড়া, সেলামী তিনশো। পারবে দিতে?"

"সে কি কথা? তাহ'লে, না হয় কলকাতার আশে-পাশে একটুকরো জমি নিয়ে খড়ের ঘর তুলে থাকিগে চল। মামীমারা তাই করেছেন।"

"তোমার মামা ছিলেন ময়মনসিংহের পাটব্যবসায়ী। নগদ টাকার অভাব নেই। জমি কিনে ঘর তোলা তাঁরই সাজে। আমার পক্ষে আকাশ-কুসুম মাত্র। জমির দাম আছে। খড়ের ঘর তুললেও খড় কিনতে হ'বে। জমি কেনা কি আমার সাধ্য। জন্মেও হ'বে না।"

নিরুপায় জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। চোখের জলে অন্ন লবণাক্ত হইয়া যাইত। প্রাণ হয়তো মানের চেয়ে বেশী, তাই বাড়ীওয়ালার নির্যাতন সহ্য হইল। অবশেষে বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় বাড়ীওয়ালার সহিত একটা রক্ষা করিয়া ফেলিলাম। করুণার গলার হারগাছা গেল, আর মনের কোণে জাগিয়া রহিল নিজের আশ্রয়-নির্মানের পণ। অপমান শেষ হইলেও তিক্ত স্মৃতি রহিল। আমার আশ্রয় কোথায়?

একদিন জ্যৈষ্ঠের বৈকালে একটি কাল চেহারার রোগা ছেলে আসিল—একখানা চিঠি আছে আপনার নামে। একবার পড়ে দেখুন।"

বহুদিন পরে কাঠঠোকরা লিখিয়াছে। ব্যগ্র আগ্রহে পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

শ্রীদেববাবু,

চিঠি পাওয়া মাত্র জানবেন আমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন জেনেই আমি চিঠি লিখে রাখলাম।

আমার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করা আপনার অন্যায় হয়েছিল। আমি আপনাকে ভালবাসতাম।

আপনাকে সামান্য একটি উপহার দিয়ে যাচ্ছি। গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দেবেন।

কুন্তলা বসু

ছেলেটি বরানগরে লইয়া আসিল। গঙ্গার ধারে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, এবড়ো-খেবড়ো, রুক্ষ। ছেলেটি বলিল, "স্কুলে চাকুরি নিয়ে টাকা জমিয়ে জমিয়ে অতিকষ্টে সস্তায় জমিটা কিনেছিলেন পিসীমা। বড় সাধ ছিল অর্ধেকটা চড়া দরে বিক্রী করে বাকী অর্ধেকে খোলামেলা বাড়ী তুলে বাস করবেন। আশা মিটল না। শরীর অতি পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। নিউমোনিয়ার ধাক্কা সামলাতে পারলেন না।"

বিস্মিত হইয়া বিশাল ভূভাগের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অনাবৃত নিদাঘের রৌদ্রালোক সারা মাটীতে জ্বলিতেছে কাহারও অতৃপ্ত বাসনার মত। অযাচিত, অনাহুত উপহার অনাত্মীয়কে। যে দিয়াছে, সে তাহার শ্রেষ্ঠ দান দিয়াছে, তাহার মত শুভার্থী আমার কেউ ছিল না।

ছেলেটি আস্তে আস্তে বলিল, "পিসীমা তো বিয়ে করেন নি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা—এই দানপত্র ধরুন। আপনি জমিটা নিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করুন। পিসীমার মনের কথা সবাই জানত।"

শুধু আমি-ই জানি নাই। পাষাণের মোহে মৃন্ময়কে চাহিয়া দেখিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আমার অশ্রু রুক্ষ ভূমিভাগের উপর অতর্কিতে ঝরিয়া পড়িল। মনে পড়িয়া গেল কাল হাতে শুভ্র চন্দ্রপুলি। শ্রীহীনার উপহার—শ্যামল আশ্রয় ভূমিশ্রী। সেই মহিয়সী এক নিমেষে আমার বঞ্চিত জীবনকে ধন্য করিয়া দিল।